# রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ

রোমাঁ রোলাঁ

সম্পাদনা, জীবনী ও ভাষান্তর

ঋষি দাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা : ১৩৫৪

প্রাপ্তিস্থান :

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ( দোতলা ), কলিকাতা ৭০০ ০০৭ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ অজস্র উপন্যাস, নাটক, জীবনী ও নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এইসব লেখার ফাঁকে তিনি ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত যে নিয়মিত দিনপঞ্জি (Diary) রেখে গেছেন, তা যেমন বিশাল, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনপঞ্জি দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ মাত্র নয়, একটি বিবেকের নিরন্তর সংগ্রামের দলিল, যা কার্যত ঐ যুগের বিশ্বমানবতার বিবেকের সংগ্রামের দলিলে পরিণত হয়েছে।

এই বিপুলকায় দিনপঞ্জি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই দিনপঞ্জি থেকে 'ভারতবর্ষ' সম্পর্কে রোমাঁ রোঁলার চিন্তাগুলিকে পৃথক্‌ভাবে একত্রিত ক'রে Inde নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এই Inde-এ আছে ভারতবর্ষের সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, জওহরলাল, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ প্রমুখ অসংখ্য মহামানব ও মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও হৃদয়-বিনিময়ের কাহিনী।

Inde-ও একটি বিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ফরাসী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছেন কলিকাতার সুখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাবের দুঃসাহসিক প্রকাশক বন্ধুবর বিমল মিত্র। অনুবাদ করেছেন সুধী অধ্যাপক ও ফরাসী ভাষাবিদ্ অবন্তীকুমার সান্যাল 'ভারতবর্ষ' নামে।

Inde বা ভারতবর্ষ গ্রন্থ থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রেমীদের জন্য রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং তার বহু বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও কর্মকর্তাদের সম্পর্কে রোলাঁর নেপথ্য-চিন্তাগুলিকে পৃথক ক'রে এই পুস্তকে সংকলিত করেছেন বন্ধুবর ঋষি দাস।

দিনপঞ্জি সাধারণত সংক্ষিপ্ত ভাষায় ও সূত্রাকারে লিখিত হয়। ফলে তা সর্বত্র সাবলীল ও স্বচ্ছন্দগতি হয় না। অনেক সময় সাধারণ

পাঠকের কাছে কিছুটা অস্পষ্টও থেকে যায়। দিনপঞ্জি নিজের জন্য লেখা, পাঠকের জন্য লেখা নয়। এটা লেখকের সাজঘর। কিন্তু অনেক কৌতূহলী পাঠক লেখকের এই নেপথ্যলোকেও উঁকি দিয়ে দেখতে চান। তাঁদের জন্যই আমাদের এই সংকলন-প্রচেষ্টা।

আমাদের এই প্রচেষ্টা কতোখানি সমীচীন ও সার্থক হয়েছে, তা বিচার করবেন দরদী পাঠকরা। নমস্কারান্তে—

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

# রোলাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

Romain Rolland—রম্যাঁ রলাঁ। আমরা আটপৌরে বাংলায় বলি—রোমাঁ রোলাঁ। সত্যি, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, পশ্চিমী লেখক ও মনীষীদের নামের মধ্যে এমন সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত আটপৌরে নাম সম্ভবত আর নেই। বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগই তাঁকে বাঙালীদের কাছে এত পরিচিত ও প্রিয় করে তুলেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে যেসব সাহিত্যিক ও মনীষী খ্যাতি ও সম্মান-শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রোলাঁ ছিলেন অগ্রগণ্য। সম্ভবত পাশ্চাত্ত্য জগতে লেও টলস্টয় ও বার্নার্ড শ ছাড়া এমন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও সম্মান-শ্রদ্ধার অধিকারী আর কেউ হননি। কেবল ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, জীবনীকার, সমালোচক রূপেই নয়, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সঙ্গীতবেত্তা, মানবতাবাদী, শান্তিবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। উগ্র জাতীয়তাবাদ, সমরবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফাসিবাদ ও নাৎসিবাদের তিনি ছিলেন প্রবলতম শত্রু। দুই বিশ্বযুদ্ধের ও তার অন্তর্বর্তীকালের বিভীষিকাময় দিনগুলিতেও, যখন অধিকাংশ শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও মনীষী উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং ফাসিবাদ-নাৎসিবাদের শিকার হয়েছিলেন, তখনও রোলাঁ তাঁর বিশ্ব-মানবতা, আন্তর্জাতিকতা, শান্তি ও প্রেমের নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। জার্মানি ও ফ্রান্সের চিরবিবদমান দুই জাতির মিলন ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে তিনি একদা যে-যাত্রা শুরু করেছিলেন যৌবনে, তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, সকল মানুষের, সকল জাতির মিলন ও মৈত্রীর মহাবাণীর সাগর-সঙ্গমে গিয়ে উপনীত হয়েছিল তাঁর পরিণত প্রৌঢ়ত্বে।

এই ঋজু যাত্রাপথ থেকে কোনো বাধা, কোনো প্রলোভন, কোনো শাসন তাঁকে তিলমাত্রও বিচ্যুত করতে পারে নি।

ভারতবর্ষের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য এবং স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত দাবিকে পশ্চিমের মানুষের কাছে তুলে ধরতে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন, তা সত্যিই ছিল অতুলনীয়। তাই সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর বাসস্থানটি প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছিল পশ্চিম দুনিয়ায় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূতাবাস এবং পশ্চিমযাত্রী প্রতিটি ভারতীয়ের পক্ষে অবশ্য-দর্শনীয় পবিত্র তীর্থস্থান। সুবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, লালা লজপত রায়, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রখ্যাত, অল্পখ্যাত বা অখ্যাত ভারতীয়, কেউই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে পশ্চিম-ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করতে পারেন নি। ভারতীয়দের জন্য তাঁর উদার বক্ষ চিরদিনই ছিল উন্মুক্ত। বহু ভারতবন্ধু ছিলেন পশ্চিম জগতে, কিন্তু রোলাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি ফ্রান্সের ক্লামেসিতে রোমাঁ রোঁলার জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই রোঁলা ছিলেন স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুর্বল। রোঁলা পরিবারের অনেকেই ছিলেন আইনব্যবসায়ী। কিন্তু রোলাঁর শিক্ষা বাল্যকাল থেকেই অন্য পথে চালিত হয়। গোড়ার দিকে তাঁকে পলিটেকনিক স্কুলে পড়বার জন্য কিছুদিন তৈরি করা হয়। তিনি সেই সঙ্গে মার কাছে সঙ্গীতবিদ্যায় প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন। এই সঙ্গীত ও সঙ্গীতবিদ্যা পরবর্তী জীবনে তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

১৮৭২ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্লামেসিতে কলেজে (বর্তমানে রোমাঁ রোলাঁ কলেজ) শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাবা ও মার সঙ্গে রাজধানী প্যারিসে আসেন এবং এখানে স্যাঁ লুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য তাঁর পিতামাতাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ষোল

বৎসর বয়সে, তাঁকে স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে পাঠানো হয়। সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়-অধ্যুষিত এই শান্তিপূর্ণ দেশটি তাঁর মানসিক বিকাশেও যথেষ্ট সহায়তা করে। রোলাঁ ভবিষ্যৎ জীবনে যে শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন, তার বীজ সম্ভবত তাঁর কিশোর-জীবনে এখানেই উপ্ত হয়েছিল। তাঁর মায়ের বন্ধু ছিলেন সংগীতজ্ঞা মাদাম মার্ত্যাঁ। মাদাম মার্ত্যাঁর বাড়িতে যাওয়ার পথে ভিল্‌ন্যুভে ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্‌তর হিউগোর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। ভিক্‌তর হিউগো তখন বৃদ্ধ। তিনি কিশোর রোলাঁকে মুগ্ধ করেন। এই সাক্ষাৎকার রোলাঁর মনের উপর নিঃসন্দেহে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। সম্ভবত ভবিষ্যৎ জীবনে ভিক্‌তর হিউগোর মতোই একজন সুবিখ্যাত লেখক ও ঔপন্যাসিক হওয়ার সঙ্কল্পের বীজ এই সময়েই তাঁর অন্তরে অঙ্কুরিত হয়।

উচ্চশিক্ষার জন্য একল্‌ নরমাল স্যুপেরিয়রে প্রবেশের উপযুক্ততা অর্জনের জন্য তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লুই-ল্য-গ্রাঁ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু এই সময় স্কুলের পড়ার চেয়ে সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি টলস্টয়, হিউগো ও শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা পড়ায় ও জার্মান সুরকার রিচার্ড ভাগ্‌নারের সঙ্গীত শোনায় মত্ত থাকেন। ফলে ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সেজন্য তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করেন না। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি সানন্দে বলেন: "শেক্‌স্‌পীয়র ও হিউগো পড়ে যে সময় আমি নষ্ট করেছিলাম তা জীবনে যোগ হয়েছে।" জার্মান সঙ্গীতশিল্পী রিচার্ড ভাগ্‌নার ইউরোপীয় সঙ্গীতে যুগান্তর এনেছিলেন। বার্নার্ড শ-কেও তরুণ বয়সে ভাগ্‌নার একদা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। কিশোর রোলাঁ তাঁর সহপাঠী ক্লোদেলের সঙ্গে রিচার্ড ভাগনারের সঙ্গীত ও গীতিনাট্যগুলি শুনে বেড়াতেন। পরবর্তী জীবনে রোলাঁ সম্ভবত তাই এক সঙ্গীত-

কারকেই তাঁর প্রথম মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'জঁা ক্রিস্তফ্'-এর নায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বিশ বছর বয়সে, তিনি একল্ নরমাল স্যুপেরিয়রে ভর্তি হন। এখানে তিনি প্রথমে কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র পড়েন, তারপর দর্শন ছেড়ে পড়েন ইতিহাস। তাঁর অধ্যাপকরা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। এখানে পড়বার সময়ে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেও টলস্টয়কে পরপর দুখানি চিঠি লেখেন। টলস্টয় তাঁর চিঠির উত্তর দেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ ইতিহাসে ডিগ্রি লাভ করেন এবং রোমের একল্ ফ্রাঁসেইজের সদস্য হন। তিনি রোমে যান এবং ভাটিকানের মহাফেজখানায় কিছুদিন গবেষণা করেন। তিনি ইতালি পরিভ্রমণ করেন এবং ফ্লোরেন্স, সিয়েরে ও সিসিলির প্রত্নশালাগুলি দেখেন। ইতালিতেই ঐ যুগের মহীয়সী মহিলা মালভিদা ফন মেইনজেনবার্গের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ঘটে। এই মহীয়সী মহিলা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। তিনি রচনা করেন তাঁর অধুনা-বিস্মৃত নাটক 'অরসিনো'। শেক্স্পীয়রের নাটকগুলি তাঁকে কৈশোরে যে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, কোন কোন সমালোচকের মতে, এই নাটকখানিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি কিছুদিন মধ্যপ্রাচ্যে বেইরুট ভ্রমণেও যান। তারপর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে ফিরে আসেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্সিকায় শিক্ষকের একটি পদ লাভ করেন। কিন্তু মন্দ স্বাস্থ্যের জন্য ঐ পদে যোগ দিতে পারেন না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রাচীন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মিশেল ব্রেআলের কন্যা ক্লতিন্দ ব্রেআলকে বিবাহ করেন। ঐ সময়ে কিছুদিন আবার রোমে গিয়ে বাস করেন। তারপর প্যারিসে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে রোলাঁ 'ডক্টর অব লেটার্স' ( ডি. লিট. ) ডিগ্রির জন্য

গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রাক্-সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সঙ্গীত। এই গবেষণার ফলে তিনি 'ল্যুল্লি ও স্কারলত্তির পূর্ববর্তী ইউরোপীয় অপেরার (গীতিনাট্যের) ইতিহাস' থিসিসরূপে রচনা করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডি. লিট. ডিগ্রি পান এবং একল্ নরমাল স্যুপেরিয়রে কলাশিল্পের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এই সময়ে (১৮৯৫—১৯০৩) তিনি আবার নাটকরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে নাটকগুলি রচনা করেন, সেগুলির কয়েকটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং তাঁকে উদীয়মান শক্তিশালী নাট্যকারের খ্যাতি ও সম্মান দেয়।

ইতিমধ্যে (১৯০১) ক্লতিল্দের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এই বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি নিজেই মন্তব্য করেন যে, 'যাকে ভালেবেসেছি, যাকে এখনও ভালোবাসি, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হল, কারণ আমাদের দুটি জীবন কেউই কারও জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চায় নি। দুটিই গিয়েছে দুই বিপরীত লক্ষ্যে।'

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যোপম উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তফ্"-এর রচনা শুরু হয়।

জাঁ ক্রিস্তফের রচনা চলে দীর্ঘ আট বছর ধরে, ১৯০৪ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ হয় দশ খণ্ডে। এই উপন্যাসের নায়ক জাঁ ক্রিস্তফ্ এক সঙ্গীতশিল্পী। জন্মকাল থেকে এই প্রতিভাধর সঙ্গীতশিল্পীর জীবনের বিকাশ, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সংগ্রাম, সত্য ও মানবতার জন্যে দুঃখবরণ, তার শক্তি, তার দুর্বলতা, নানা কিছু অপূর্ব ভঙ্গিমায় প্রদর্শিত হয়েছে,—যা কেবল ইউরোপীয় সাহিত্য-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, যা সারা বিশ্বের সভ্য-শিক্ষিত মানুষকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল এবং রোলাঁকে দিয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে সম্মানের স্থান।

ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁর জীবনে একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পা ভেঙে যায়। এই আঘাত থেকে তিনি আর সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর বাঁ-হাত ও বাঁ-পা চিরকালের জন্যে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনার জন্যে ক্ষতিপূরণের যে মামলা তিনি করেন, তাতে জিতে ২৫০০০ ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ পান। এর পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে সাহিত্য-রচনায় সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে থাকেন, 'কলাব্রিয়ঁন' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। ফরাসী আকাদেমি তাঁকে 'গ্রাঁ প্রি' বা মহা পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। মানসিক দিক থেকে রোলাঁ প্রচণ্ড আঘাত পান। যে জার্মানি ও ফ্রান্সের মৈত্রী তথা বিশ্বশান্তি ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান আদর্শ, তা যেন তাঁর চোখের সামনে যুদ্ধের আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ে যায়। এই সময়ে বহু সাহিত্যিকই ভারসাম্য হারিয়ে আদর্শচ্যুত হয়েছিলেন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। হাউপ্টমান, টমাস মান, আঁদ্রে জিদ, আনাতল ফ্রাঁস প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ও ফরাসী সাহিত্যিকরাও বাদ যান নি। রোলাঁর লেখনী কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির জন্যে অক্লান্ত সংগ্রাম চালাতে থাকে। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি লেখেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনীর লুভ্যাঁ ধ্বংসের প্রতিবাদে তিনি জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টমানকে একটি খোলা চিঠি লেখেন। তিনি পরিণত হন যুধ্যমান ইউরোপের জাগ্রত বিবেকে। যুদ্ধ চলতে থাকে, যুদ্ধবাদীরা স্বদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের নামে তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়। তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির জন্য তাঁর সংগ্রাম অবিরাম চলতে থাকে। আর্ত মানুষের সেবাতেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রেড

ক্রুশের অধীনে যুদ্ধবাদীদের আন্তর্জাতিক সাহায্য-প্রতিষ্ঠানে কাজও করেন।

সেই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডে রোলাঁার সঙ্গে রুশ বলশেভিকদের পরিচয় ঘটে। শ্রমিক আন্দোলনের অনেক বড় বড় নেতাও তখন উগ্র জাতীয়তাবাদের স্রোতে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ভেসে চলেছেন। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদ লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বলশেভিকদের স্পর্শ করতে পারে নি। তারা তাই দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, শত্রুর চর রূপে চিহ্নিত হয়েছিল দেশে। লেনিন, লুনাচার্স্কি, জিনোভিয়েভ, রাদেক প্রভৃতি রুশ নেতারা তখন দেশ থেকে পালিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটল রোলাঁার। কিন্তু আদর্শবাদী রোলাঁার সঙ্গে এঁদের চিন্তাধারার গভীর পার্থক্য থাকাই ছিল স্বাভাবিক। রোলাঁ ভাবছিলেন, মানুষকে ঠিকমতো মানবতায়, প্রেমে ও মৈত্রীর বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারলেই,—তাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারলেই,—যুদ্ধ যে কত বড় অপরাধ, এ যে পরম নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মহত্যা ও ধ্বংসের পথ মাত্র, তা বোঝাতে পারলেই, যুদ্ধের অবসান ঘটানো যাবে। কিন্তু লেনিনের কাছে যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি; ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের ফল সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদ; যতদিন না ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও বিলোপ ঘটে পৃথিবীতে, ততদিন যুদ্ধ থাকবেই। একমাত্র শ্রমিক বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের ধ্বংস ঘটলেই পৃথিবী থেকে যুদ্ধের বিলোপ ঘটবে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী। যুদ্ধ যেমন ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অমোঘ পরিণতি, বিপ্লবও তেমনি অমোঘ পরিণতি ধনবাদী সমাজের। রোলাঁ সেদিন লেনিন ও বলশেভিকদের এই মতবাদে বিশ্বাস করেন নি। কারণ, বিপ্লব মানেই তো শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, হিংসা, রক্তপাত, যুদ্ধ। হিংসা ও যুদ্ধের মাধ্যমেই অহিংসা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে, একথা তাঁর ভাববাদী মন সেদিন বিশ্বাস করে নি। কিন্তু রোলাঁ কখনও কোনো চিন্তাকে ঘৃণার সঙ্গে অস্পৃশ্য ভেবে প্রত্যাখ্যান করেন নি,

তাই তাঁর মনে সংশয় জেগেছিল এবং ক্রমেই তাঁর মন একদিন একেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই পরবর্তী কালে লিখেছিলেন :

"১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের ভাবী শিক্ষামন্ত্রী আনাতোল লুনাচারস্কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ইনি আমার কাছে এলেন যেন ভবিষ্যতের অগ্রদূত হয়ে, এলেন ভাবী বিপ্লবের অগ্রিম বার্তা নিয়ে। তিনি আমাকে বললেন, যুদ্ধের পরে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটবে। কথাটা এমনভাবে বললেন যে, মনে হল সব যেন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার পায়ের নিচে এক নতুন ইউরোপ, এক নতুন সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে। সেই নতুন জগতের স্পর্শ অনুভব করে আমি আশ্বস্ত হলাম।"

কিন্তু যে রোমান ক্যাথলিক চিন্তাধারার মধ্যে তিনি আশৈশব লালিত হয়েছেন, যে আধ্যাত্মিক আদর্শে তাঁর নিজের অন্তর ও বিবেক ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছে, যে ভাববাদের মধ্যে তাঁর নিজের চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশ পেয়েছে, তাতে লেনিন ও বলশেভিকদের এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও বিপ্লবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো না। তবে তিনি বুঝলেন, এই অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যে পূর্ণ সমাজব্যবস্থায় দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লবের প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিপ্লব কোন্ পথে আসবে? হিংসার রক্তাক্ত পথে? শ্রেণী-বিদ্বেষ ও শ্রেণী-সংগ্রামের পথে? প্রেম ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী রোলাঁর তাতে সংশয় রয়ে গেল স্বাভাবিকভাবেই।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও বিশ্বশান্তির পক্ষে তাঁর প্রচার চলতে লাগলো। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ইউরোপে তাঁর শান্তি ও প্রেমের বাণী দুঃসহ ক্ষতে সঞ্জীবনী প্রলেপের মতো মনে হল। তাঁর বিরুদ্ধে যে কুৎসা ও অপপ্রচার মুখর হয়ে উঠেছিল, তা স্তিমিত হয়ে এল। তাঁর জনপ্রিয়তা ও সম্মান আবার 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' স্থান পেল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইডিশ আকাদেমি তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে সম্মানিত করল।

রোলাঁ পুরস্কারের এক কপর্দকও নিজের জন্য নিলেন না, সমস্ত অর্থ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু মানবতার সেবায় রেড ক্রশকে দান করলেন।

কিন্তু লুনাচারস্কির কথা মিথ্যা দম্ভোক্তি বা আদর্শবাদীর কল্পনাবিলাস ছিল না। রোলাঁর নোবেল পুরস্কার লাভের পাঁচ মাসের মধ্যেই লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটল রাশিয়ায়। এই সংবাদ পেয়ে বিপ্লবকে, "মুক্ত ও মুক্তিদাতা রাশিয়াকে" রোলাঁ পরম উল্লাসেই অভিনন্দন জানালেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই পরবর্তী কালে বলেছেন :

"...১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জবর খবর এল। আশায় অধীর উত্তরে হাওয়া জেনেভার পথে পথে সে খবর বয়ে আনল। বাতাসে রক্তিম বসন্তের সৌরভ পাওয়া গেল। খবর এল, রাশিয়া তার শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে। এই সময়েই গর্কির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। লেখক চিঠির মাঝখানে হঠাৎ থেমে—নতুন বড়দিনের আনন্দবার্তা জানিয়েছেন! খ্রীষ্টের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে রোলাঁ জেনেভায় স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে স্বাক্ষর দিয়ে প্রকাশ করলেন এক পুস্তিকা, তার আবেদন-পত্রটি লিখলেন তিনি নিজে, আবেদনের শিরোনামা হ'ল "মুক্ত ও মুক্তিদাতা রাশিয়ার প্রতি"।

সোভিয়েত বিপ্লবকে স্বাগত অভিনন্দন জানালেও, তাকে মানবের মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করলেও, সোভিয়েত বিপ্লবের রক্তাক্ত পথকে কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারলেন না। বিপ্লব চাই, এই অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যে ভরা সমাজব্যবস্থার ধ্বংস এবং ন্যায়, সুবিচার ও সাম্যে ভরা এক নতুন জগতের সৃষ্টি চাই ; কিন্তু সেজন্য এই রক্তাক্ত পথ ছাড়া কী আর কোনও পথ নেই—যে পথ ক্ষমা, প্রেম ও অহিংসায় কুসুমাস্তীর্ণ? প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন রোলাঁ। তিনি বিপ্লব চান, কিন্তু রুশ-বিপ্লবের পথকে একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে পারেন না। পরবর্তী কালে তাঁর এই সময়কার মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছিলেন :

"আমি ছিলাম কর্মী; আমার কাজ ছিল চিন্তা; আমি ভাবতাম ইউরোপের চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ রাখবার চেষ্টা করাই আমার কাজ।" তাই রুশ-বিপ্লবকে অভিনন্দন জানালেও রুশ-বিপ্লবের পথকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। লেনিন তাঁকে বিপ্লবী রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানালেও তিনি যেতে চাইলেন না সেখানে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। মিত্রশক্তির সঙ্গে তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সও জয়ী হল। বিধ্বস্ত পদদলিত হল জার্মানি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাঈয়ে যে সন্ধি হল তাতে তিনি বিজয়ীর বীভৎস অট্টহাস্য শুনলেন, শুনলেন পরাজিতের আর্তনাদ। তিনি ভের্সাঈ-চুক্তিকে পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "বেদনাদায়ক চুক্তি: মানুষের দুই হত্যা-কাণ্ডের মধ্যেকার অট্টহাসির জন্য বিরতিপর্ব।"

মানুষের আত্মার, চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতার কথাই এখন তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল। তিনি রচনা করলেন 'আত্মার স্বাধীনতার ঘোষণা" নামে ইশ্‌তেহার। সেটি ফ্রান্সের বিখ্যাত 'ল্যুমানিতে' ( 'মানবতা' ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে প্রায় সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর দেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। এই ঘোষণাপত্রও রোলাঁই লিখেছিলেন।

"উত্তিষ্ঠত। এস, আমরা এইসব আপোস, এইসব জোট-বাঁধাবাঁধি, এই প্রচ্ছন্ন দাসত্ব থেকে আত্মাকে মুক্ত করি। আত্মা কারও দাস নয়। আমাদের অন্য কোনও প্রভু নেই···আমরা কেবলমাত্র সত্যেরই সেবা করি, যে সত্য মুক্ত, সীমান্তহীন, সীমাহীন, জাতি ও জাতের সংস্কারশূন্য··· আমরা মানবতার জন্য কাজ করে যাব, সমগ্র অখণ্ড মানবতার জন্য। আমরা দেশ ও জাতি স্বীকার করি না, আমরা স্বীকার করি জনগণকে —যা এক, অখণ্ড ও বিশ্বজনীন।"

এই সময় ( ১৯১৯ ) থেকে রোলাঁর মনের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। কেবল আত্মিক শক্তি—জ্ঞান ও প্রেম—দিয়েই কী জনগণকে

তার দাসত্ব থেকে, অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যের পেষণ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব ?

অধ্যাত্ম শক্তিতে আশৈশব বিশ্বাসী রোলাঁ বস্তুবাদী বিপ্লবের পথকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না, আত্মিক পথেই অগ্রসর হতে চাইলেন— এই দুই পথকেই তিনি একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ বলে মনে করলেন সত্য, তবে আত্মিক পথই যে শ্রেয়, তাতে তাঁর বিশ্বাস অবিচল রইল।

কিন্তু তবু তাঁর বিবেকের সংগ্রাম চলল—এই সংগ্রাম তিনি লিপিবদ্ধ করলেন 'ক্যাঁজ আঁ দ্য কবা' (পনেরো বছর, ১৯১৯-১৯৩৪, ব্যাপী বিবেকের সংগ্রাম) নামক গ্রন্থে। ইংরেজিতে তা সেল্‌ভাংকর অনুবাদ করেছেন I Will Not Rest ও বাংলায় সরোজ দত্ত অনুবাদ করেছেন 'শিল্পীর নবজন্ম' নামে।

রোলাঁ বিপ্লবকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু পথের সমস্যা তাঁর কাছে দুরূহ। বিপ্লবের সঙ্গে বলপ্রয়োগ ও হিংসা অনিবার্যভাবে জড়িত। কিন্তু বলপ্রয়োগ ও হিংসার পথকে তিনি একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। ঐ সময় নিজের মনের অবস্থার কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন—"বিপ্লব ও চিন্তার স্বাধীনতা কোনোটাকেই আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম না।"

বিপ্লবের পক্ষ-সমর্থক ফরাসী লেখক অঁ্যারি বারব্যুসকে তিনি ঐ সময়ে লেখেন ঃ

"লক্ষ্য ঠিক হলেই যে-কোনো উপায়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো নীতি-সংগত, একথা সত্য নয়। সত্যকার প্রগতির পক্ষে লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে লক্ষ্য-বস্তু লাভের উপায়ই বেশি মূল্যবান। কারণ, লক্ষ্যবস্তু ( যা কখনও লাভ করা যায় না, বা লাভ করা গেলেও সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় না ) কেবলমাত্র মানুষের বাইরের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। কিন্তু ন্যায় বা হিংসার ছন্দে ছন্দিত ক'রে মানুষের মনকে গড়ে তোলে লক্ষ্যলাভের উপায়। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যদি হিংসার পথই বেছে নেওয়া হয়, তবে

যে প্রকৃতির শাসনব্যবস্থাই হোক না কেন, তা প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে কখনও রক্ষা করতে পারবে না। তাই নৈতিক নীতিগুলিকে রক্ষা করা আমি একান্ত প্রয়োজন মনে করি ; আর আমার মনে হয়, সাধারণ সময়ের চেয়ে বিপ্লবের সময়ে এই প্রয়োজন আরও অনেক বেশি।"

বিপ্লব চাই, অথচ অহিংসার পথে। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিলোপ চাই, সাম্যের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই—অথচ অহিংসা ও আত্মিক শক্তির জোরে। এই রকম একটি পথের সন্ধান দিলেন মহাত্মা গান্ধী। কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভেই রোলাঁ লেও টলস্টয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই গান্ধীকে তিনি যে তারই পরিণত মূর্তি রূপে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে আশ্চর্য কি ? না, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু প্রত্যক্ষ করলেন তিনি গান্ধীর মধ্যে।

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, ভারতবর্ষ বিদেশীর শাসন-শোষণ, অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার এবং দৈন্যদুর্দশা ও শত দুঃখে জর্জরিত, প্রায় মুমূর্ষু। গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের পথে ভারতবাসী আজ দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত ও উদ্যতমুষ্টি। একটা দেশের এই প্রবল জাগরণ রোলাঁকে গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট করল। লেনিন রাশিয়ার তথা রুশ সাম্রাজ্যের অগণিত মানুষকে অন্যায়, অবিচার, অসাম্য ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য যে বিপ্লব সংঘটিত করেছেন, সে বিপ্লবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন থাকলেও, তার পথ তাঁর মনঃপূত নয়। অন্যপথে গান্ধী মানুষের আত্মিক শক্তির—অহিংস সত্যাগ্রহে যার প্রকাশ—দ্বারা ভারতের জন্য কেবল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান না, তিনি চান অন্যায়, অবিচার ও অসাম্য দূর করে সেখানে 'খ্রীষ্টান কমিউনিজম্' বা খ্রীষ্টীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। তা যদি সম্ভব হয়, তবে লেনিন যা হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা সম্ভব করেছেন বা করতে চাইছেন, তা সম্ভব হবে অহিংসা ও আত্মিক শক্তির দ্বারাই। সুতরাং লেনিনের পথের চেয়ে গান্ধীর পথই কল্যাণকর এবং পূর্ণ

লক্ষ্যে পৌঁছবার নির্ভুল পথ বলে রোলাঁর কাছে প্রতীয়মান হল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর পত্রালাপ শুরু হয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হল। রোলাঁ ইংরেজি জানতেন না, রবীন্দ্রনাথ জানতেন না ফরাসী। তাঁদের মধ্যে দোভাষারূপে কাজ করলেন রোলাঁর বিদুষী ভগিনী মাদলীন রোলাঁ। রবীন্দ্রনাথের দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব তাঁদের মুগ্ধ করল।

রোলাঁ বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। এখন ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলন, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, বিশেষতঃ গান্ধী এবং তাঁর অহিংসা ও অসহযোগ সম্পর্কে রোলাঁ অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

রোলাঁ গান্ধীজী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি প্যারিস থেকে বাবা ও বোন মাদলীনকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করবার জন্য চলে এলেন। এখানে ভিল্‌ন্যভে ভিলা অল্‌গায় সুদীর্ঘ আঠারো বছর তিনি বাস করেছিলেন, ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত।

এখানেই তিনি তাঁর মহাকাব্যোপম অন্য সুবৃহৎ উপন্যাস 'আমার্শাতে' ( বিমুগ্ধ আত্মা ) রচনা করেন। এই উপন্যাস চারখণ্ডে সমাপ্ত, এর রচনা রোলাঁর অন্যান্য রচনার সঙ্গে চলে দীর্ঘ এগারো বছর ধরে ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। এর প্রথম দুখণ্ড 'আনেৎ এ সিল্‌ভি' ( দুই বোন ) ও 'লেতে' ( সুদূরের পিয়াসী ) প্রকাশিত হয় ১৯২২ ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে তিনি রচনা করেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত জীবনী-গ্রন্থ 'মহাত্মা গান্ধী'।

রোলাঁ তাঁর জীবনে আরও অনেক শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন সত্য—যেমন, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, হান্‌ডেল, বীঠোফেন, গ্যেটে প্রভৃতি—কিন্তু 'মহাত্মা গান্ধী' তাঁর জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিল। তাঁর চিন্তা ও গবেষণা ইউরোপীয় গণ্ডি পার হয়ে এশিয়ার এক অনাবিষ্কৃত রাজ্যে প্রবেশ করল। ভারতবর্ষের সুমহান্

ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ও অনুভূতির এক নতুন জগৎকে তিনি পাশ্চাত্ত্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে ধরলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহাত্মা গান্ধী' প্রকাশিত হল। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হলেও তা ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও তার বিখ্যাত নেতাকে এক নূতন মহিমায় উদ্ভাসিত করে পাশ্চাত্ত্যবাসীর সম্মুখে স্থাপন করল। লেনিনের বিপ্লব ও বিপ্লব-পন্থাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ তাতে ছিল হিংসা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংকোচন। লেনিন-প্রদর্শিত পন্থায় বিপ্লবের চেষ্টা জার্মানিতে, ইতালিতে ও ইউরোপর অন্যান্য দেশে ব্যর্থ ও পরাভূত হয়েছিল, রাশিয়াকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে এবং বাইরের শত্রুর মিলিত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছিল, তাই 'মুক্ত ও মুক্তিদাতা রাশিয়ার' প্রতি তাঁর সমর্থন ও সহানুভূতি থাকলেও রুশ-বিপ্লব ও বিপ্লব-পন্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল দ্বিধা ও সংশয়। তাই গান্ধী-প্রদর্শিত অহিংসার পথকেই তিনি সমাজ-বিপ্লবের প্রকৃষ্ট পথ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের অগণিত নিপীড়িত দরিদ্র মানুষকে গান্ধীজী যেভাবে দোর্দণ্ড-প্রতাপ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলেছিলেন, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা রোলাঁর কাছে একটি অভিনব বিপ্লব বলেই মনে হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল এই পথ যদি সফল হয়, তবে তা দ্রুত না হলেও বিশ্ব সমাজ-ব্যবস্থায় এবং মানুষের চেতনায় ও চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাবে—যা পৃথিবীতে একদিন প্রেম ও শান্তির রাজ্য—ভগবানের রাজ্য—প্রতিষ্ঠা করবে। 'মহাত্মা গান্ধী' প্রকাশের পর রোলাঁ হয়ে উঠলেন ভারতের একান্ত আপনার জন।

১৯২৪ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আমাশাঁতে' মহা-উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড 'মা ও ছেলে' ( ১৯২৭ )। এই সময়ে ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের পাশে ইতালিতে, ফাসিস্টরা শাসনক্ষমতা অধিকারের যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, তা ছিল অহিংসা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, সকলই কিছুর বিপরীত। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির নেতৃত্বে

বলপ্রয়োগে ফাসিস্টরা শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেছিল এবং বিরোধীদের, বিশেষত কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের, নির্মমভাবে হত্যা করে দেশে এক দল ও এক ব্যক্তির শাসন কায়েমের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই নতুন এক উপদ্রবের অভ্যুত্থানে রোলাঁ ও তাঁর সমধর্মী চিন্তানায়করা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবার এলেন ইউরোপ-ভ্রমণে ( মে, ১৯২৬ )। প্রথমে এলেন ইতালিতেই। রবীন্দ্রনাথকে যে মুসোলিনি তাঁর কুকীর্তি গোপনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চাইছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ইতালির বর্তমান রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নন, তা ভেবে রোলাঁ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

সত্যিই, মুসোলিনি ও তাঁর নেতৃত্বে ফাসিস্টরা ইতালিতে যে নৃশংস নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল, এবং তার বিরুদ্ধে ইউরোপে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল, তাকে চাপা দেওয়ার জন্যই মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কবি যখন আগের বারে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কয়েকদিনের জন্য ইতালিতে ছিলেন, তখন তাঁর বক্তৃতাগুলি ফাসিস্ত-মহলে আদৌ পাত্তা পায় নি। কৌশলের দিক থেকে এটাকে ভুল মনে করে মুসোলিনি বৃটিশ-বিরোধী ভারতবর্ষের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির প্রকাশ ও পরিচয় রূপে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের জন্য বহু শত মূল্যবান ইতালীয় গ্রন্থ উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুভাষাবিদ্ তরুণ অধ্যাপক জোসেফ তুচ্চিকে পাঠিয়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মুসোলিনির এইসব ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই মুসোলিনি সরকার যখন ইতালি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানালো, তখন রবীন্দ্রনাথ তা সাদরে গ্রহণ করলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে রোমে মুসোলিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হল। রবীন্দ্রনাথকে রাজকীয় ভাবে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুসোলিনি বললেন, যাঁরা কবির প্রতিটি লেখা ইতালীয় ভাষায় পড়েছেন,

তিনি তাঁদের একজন। রবীন্দ্রনাথকে দেশোন্নয়নের ভালো ভালো ক্রিয়াকাণ্ডের কথা জানালো হল। রবীন্দ্রনাথের আগমন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা স্তুতিবাদ ইতালীয় কাগজগুলিতে বড় বড় হরফে শিরোনামায় প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ ফাসিস্টদের মুখপত্র 'ট্রিবিউনা'-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বললেন: "রোমে আমার আসা স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছে।" তিনি মুসোলিনি সম্পর্কে বললেন: "তিনি যেন দেহ ও আত্মায় মাইকেল অ্যাঞ্জোলোর হাতে তৈরি একটি মূর্তি, যাঁর প্রতিটি কাজ বুদ্ধি ও শক্তিতে ভরা।" তিনি লিখলেন: "Let me dream that from the fire-bath the immortal soul of Italy will come out clothed in quenchless light."

ইতালি-ভ্রমণশেষে রবীন্দ্রনাথ এলেন রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রোলাঁ কবিকে ইতালির প্রকৃত অবস্থা ও তার রাজনৈতিক বীভৎসতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হতে আরও কিছু বিলম্ব হয়েছিল।

১৯২৬ সালে জওহরলাল নেহরুও রোলাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তখনও রোলাঁর ব্যক্তিগত চাক্ষুষ পরিচয় না হলেও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য রোলাঁ আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

তাঁর মনে প্রথম এই কৌতূহল জাগালেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। এক অলৌকিক রূপকথার রাজ্য যেন তাঁর সম্মুখে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল। তিনি ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও লালিত হয়েছিলেন, ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর শোণিতে ও মজ্জায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় তিনি ছিলেন সুপটু। কিন্তু যখন এক মধ্যযুগীয় কল্পলোক আধুনিক যুগের, এই সেদিনের, বাস্তব ঘটনারূপে তাঁব সম্মুখে উপস্থিত হল, তখন তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সবকিছু জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, সাক্ষাৎকার, জিজ্ঞাসাবাদ,

পত্রালাপ, পড়াশুনো চললো অদম্য উদ্যমে। রাশীকৃত পুস্তক ও পুস্তিকা তিনি মন্থন করলেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই তো ছিলেন বিবেকানন্দের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, এঁদের অনেকের সঙ্গেই রোলাঁর পত্রালাপ ও সাক্ষাৎ হল। বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা, ভগিনী মিস্ ম্যাকলয়েড প্রভৃতির সঙ্গেও ঘটল তাঁর যোগাযোগ।

ইংরেজি ভাষাই ছিল এসবের মাধ্যম। রোলাঁ নিজে ইংরেজি জানতেন না। তাঁর ভগিনী বিদুষী মাদলীন রোলাঁ দোভাষীরূপে তাঁর সহায় হলেন। রোলাঁ প্রায় তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর বিখ্যাত দুটি জীবনী-গ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ' রচনা করলেন। 'রামকৃষ্ণের জীবন' প্রকাশিত হল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ও 'বিবেকানন্দের জীবনী' ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকে তিনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন না, দিতে চাইলেন সেগুলির বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তিনি রামকৃষ্ণকে যিশু খ্রীষ্টের মতোই 'নর-দেবতা' বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। রামকৃষ্ণের সবচেয়ে যা আকৃষ্ট করল তাঁকে, তা হ'ল ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী, জীব শিব ও জীব-সেবার মন্ত্র, আর বিবেকানন্দের সংস্কারহীন মুক্ত মন, মানবতা ও মানবসেবা এবং 'আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর' এই উদাত্ত বাণী।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে নাৎসী দলের অভ্যুত্থান ঘটলো। নাৎসী নায়ক এডল্ফ্ হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। হিটলারী অভ্যুত্থান জার্মানিতে যে অমানুষিক নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালালো, তাতে রোলাঁর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। কমিউনিস্টদের হত্যা ও বিতাড়নের জন্য হিটলার রাইখস্টাগে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটালেন, রোলাঁ তার ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। জার্মান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্যেটে পদক' তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। এই বৎসরই তিনি 'আমাশাঁতে' মহা-উপন্যাসের শেষ

পর্ব 'ঘোষণাকারিণী' রচনা শেষ করলেন। এই পর্ব তুভাগে বিভক্ত— প্রথম ভাগ 'একটি যুগের মৃত্যু'। এই যুগ ধনতান্ত্রিক যুগ—এ যুগের য কিছু মহৎ, যা কিছু ভালো, তারই মৃত্যুর কাহিনী। দ্বিতীয় ভাগ 'শিশুর আগমন'। তাই 'আমার্শাতে' এক যুগান্তরের মহাকাব্য।

হিটলার তাঁর 'মাইন কাম্‌ফ্‌'-এ ('আমার সংগ্রাম') যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন, তা ছিল নির্লজ্জ একনায়কত্ব, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের আস্ফালন। জার্মানিতে নির্লজ্জভাবে শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট ও ইহুদী নিধন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লেশমাত্র ছিল না, চারদিকে চলছিল নির্লজ্জ ও নগ্ন হিংসা ও লালসার বীভৎস তাণ্ডব। অন্যান্য দেশেও ফাসিবাদ ও নাৎসিবাদ মাথা তুলে উঠেছিল। গণতন্ত্রের ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারী বলে যারা দাবি করে, সেইসব দেশও, ইংলণ্ড, ফ্রান্স আমেরিকা, জার্মানির নাৎসী শাসকদের তোষণে ব্যস্ত ছিল। হিটলার তাদের সম্মুখে টোপ ফেলেছিলেন, বলেছিলেন, তাঁর রণসজ্জা ও দেশকে একনায়কত্বের অধীনে শক্তিশালী করার মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সকল সতর্কবাণী তাই ব্যর্থ হচ্ছিল। ক্রমেই রোলাঁ অস্থির ও বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সুপরিচিত পথগুলোর মধ্যেই তিনি পথের সন্ধান খুঁজছিলেন।

'মুক্ত ও মুক্তিদাতা' রাশিয়ার বিপ্লবকে তিনি যেমন ভোলেননি তেমনি তিনি ভোলেননি পরাধীন নিপীড়িত দরিদ্র ভারতের জন্য গান্ধীর আত্মিক অহিংস সংগ্রামকে, তিনি ভোলেননি বিবেকানন্দের সেই অমর বাণী "আর্তপীড়িতই আমার ঈশ্বর।" তাই ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে তিনি লেখেন, "আমি একটি মাত্র পবিত্র ঐক্যকে চিনি,—তা হচ্ছে সমগ্র জগতের অত্যাচারিতের সঙ্গে ঐক্য—'আর্তপীড়িতই আমার ঈশ্বর' বলেছিলেন ভারতবর্ষের বিবেকানন্দ,—আর তা ইউরোপের খ্রীষ্ট বলেছিলেন স্পষ্টাক্ষরে—আর এই একই মন নিয়ে, কিন্তু পৃথক পৃথক

অস্ত্রে লড়াই করেছেন গান্ধীরা ও লেনিনরা। আমি তাঁদের বাহিনীরই এক যোদ্ধা।"

লেনিন, গান্ধী ও বিবেকানন্দের পথ ভিন্ন হলেও তাঁদের লক্ষ্য যে এক—পৃথিবীর আর্ত-নিপীড়িত মানুষকে অন্যায়, অবিচার ও অসাম্য থেকে উদ্ধার করা—এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি।

তাঁর লেখনী বিরত ছিল না। ফাসিবাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে, দেশে দেশে কমিউনিস্ট নেতাদের প্রতি অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিগর্ভ লেখনী সদা-সোচ্চার ছিল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

এই সময়ে অহিংসা ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে তাঁর স্থির প্রত্যয়ে চিড় ধরে। হিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সোভিয়েত রাষ্ট্রই যে ফাসিবাদের এই নির্লজ্জ সমুদ্যত হিংসা ও নিপীড়নকে রোধ করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে রোলাঁ গান্ধীজীকে এক পত্রে লেখেন:

"একমাত্র (রাশিয়ার) সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রগুলির মহিমান্বিত সংঘই আরও বুদ্ধিদৃপ্ত এবং আরও ন্যায়পরায়ণ এক নূতন সমাজব্যবস্থার রক্ষণ ও নির্মাণকাণ্ডের জন্য অটুটভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে মুক্ত ও শিক্ষিত শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হবে।

"কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, ইউরোপের যদি 'ফাসিস্তীকরণ' ঘটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানের সঙ্গে হাত মেলাবে, এবং সম্ভব হলে হাত মেলাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গেও, যাতে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। কারণ, যেসব শক্তি শ্রমের অন্যায় শোষণের উপর বেঁচে আছে, এই সোভিয়েত রাশিয়া শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের জন্যই তাদের কাছে স্থায়ী বিপদাশংকা হয়ে আছে।

"আমরা ইউরোপীয়রা, যারা স্বাধীন, যারা সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিবাদের আপোসহীন বিরোধী—আমাদের তাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে

সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষা করা। সামাজিক নির্মাণকাণ্ডের আশা-ভরসার অপরিহার্য ভিত্তি সে।

"কিন্তু কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব? সত্যাগ্রহ দিয়ে? নিষ্ক্রিয়া দিয়ে, হিংসাকে অস্বীকার করে? এই কৌশল, এই মানসিকতার জন্য ইউরোপের জনসাধারণ একটুও প্রস্তুত হয় নি। কোনো কোনো দেশে এখানে-ওখানে "বিবেকশীল প্রতিবাদীদের" (Conseeintious Objectors) ছোট ছোট কেন্দ্র আছে; কিন্তু তাদের বিবেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রায়ই যৌথকর্মের উপযুক্ত সকল প্রকার সংগঠনেই আপত্তি করে। ...ব্যক্তিগতভাবে 'প্রতিবাদীরা' আত্মবিসর্জন দিয়ে নিজেদের আত্মাকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু অন্যের আত্মা বা জীবনকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা বেশি মাথা ঘামান না। এমন হতে পারে যে, কয়েক শতাব্দী পরে তাঁদের আত্মবিসর্জন ফলপ্রসূ হবে, ভবিষ্যতের চক্ষে জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেবে যেমনটি হয়েছিল প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মের শহীদদের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজকের এই ট্র্যাজিক মুহূর্তে অনিবার্য ভবিষ্যতের কিছুই সে রদ-বদল করতে পারে না। সেই ভবিষ্যৎ দুই পরস্পরবিরোধী জগৎকে মুখোমুখি সংঘর্ষে এনে দাঁড় করিয়েছে: একদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেবায় নিযুক্ত ফাসিস্ট একনায়কত্ব,—এবং অন্যদিকে সর্বহারার বিপ্লব। আমাদের পক্ষ বেছে নিতে হবে।"

রোলাঁর পক্ষ বেছে নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়নি আর। ১৯৩৫ সালে তাঁর 'পনের বছরের বিবেকের সংগ্রাম' (সরোজ দত্ত বাংলায় 'শিল্পীর নবজন্ম' নামে এর অনুবাদ করেছেন) প্রকাশিত হয়। এতে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পনের বছর তাঁর মনের ও আদর্শের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল তার বিবরণ আছে। তাতে তিনি উন্মুক্তকণ্ঠে বলেছেন:

"আমার সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই গতিপন্থী। যারা থেমে নেই তাদের জন্যেই আমি চিরদিন লিখেছি। আমি নিজে কোনদিন থামিনি, আশা করি যতদিন বাঁচব থামব না। জীবন যদি সম্মুখপানে চিরচলমান

না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কেটে চলেছে মহামানবের সমুদ্রপানে, আমি আছি তাদেরই সঙ্গে। সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী জনসাধারণের এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সংঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য উত্তাল তরঙ্গ তাদের বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।"

অবশেষে রোলাঁ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন সোভিয়েট রাশিয়া সফরে গেলেন। সেখানে মাক্সিম গর্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। গর্কির বাড়িতেই গর্কির সাহচর্যে কাটালেন দিনগুলি। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সাক্ষাৎকার ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পর বৎসর ১৯৩৬ সালের জুন মাসে গর্কির মৃত্যু হয়।

সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁর বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য দুর্বল, কিন্তু প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তি অটুট। তিনি দিনপঞ্জী, স্মৃতিকথা, জীবনী, নাটক প্রভৃতি রচনায় তাঁর ক্ষবলিব বলিয়া

.য়ের বইটির যে

ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে ফাসিবাদ 'ঘনাইয়াছেন, তাহা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠলো। আশা-নিরাশার সঙ্গে অনুভব করিয়াছি, লাগল রোলাঁর। অবশেষে এলো ১৯৩৯ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। , নাৎসি বাহিনীর রচিত করা আমার কর্তব্য। ফ্রান্স বিধ্বস্ত ও পরাভূত হল। চারদিকেষে, কিন্তু তিনি স্বতঃ-উপলব্ধির তাণ্ডব। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার সোবিরী ছিলেন মনে হয়,—তিনি শেষ পর্যন্ত কী সোভিয়েট গণশক্তি ফাএকীভবনকে বাস্তবে পরিণত ঠেকাতে পারবে? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রারণত করিয়াছিলেন।' অপর বৃদ্ধ রোলাঁ জার্মান-পদানত ফ্রান্সের রাজ আদর্শ, বুদ্ধিগত সমন্বয়সাধনের গৃহে অশান্ত চিত্তে দিন গুনতে ল সম্পন্ন করিয়াছিলেন সরাসরি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হল। সকল ধারাবর্ষী রূপের মধ্যে

প্রথম আঘাতের ধাক্কা সামলে সোভিয়েট রাশিয়া নাৎসি বাহিনীকে যুদ্ধে পর যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে অগ্রসর হতে লাগল। এখন ফাসিস্ত শক্তি পরাজয়ে রোলাঁ নিঃসন্দেহ হলেন। কিন্তু ফাসিস্ত শক্তির চরম পরাজয় গণশক্তির দুর্নিবার বিজয় দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হল না তাঁর হিটলারের আত্মহত্যা ও জার্মানির আত্মসমর্পণের মাত্র চার মাস আগে ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, তাঁর মৃত্যু হল।

রোলাঁ জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসতেন। তাঁ বলা চলে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক ক্ষুদ্র জনপদে যে জীবন-নদীর ক্ষী ধারা উৎস থেকে নির্গত হয়েছিল তা ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর পরে মহামানবের মহাসঙ্গমে গিয়ে মিলিত হল। রোলাঁ আর জার্মানির নয় ফ্রান্সের নয়, রোলাঁ হলেন সারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের—সারা পৃথিবীর— বিশ্বমানবের। "আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর"—এই বাণীর সাধনা যে আজকের হিংসার পথে কি অহিংসার পথে—তার পাশেই রইলেন তিনি করতে পারে বাণী-মূর্তি হয়ে।
সংঘর্ষে এনে দাঁ
সেবায় নিযুক্ত ফা
আমাদের পক্ষ বেছে নি

রোলাঁর পক্ষ বেছে নি
সালে তাঁর 'পনের বছরের
'শিল্পীর নবজন্ম' নামে এর
১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য
যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল তার
বলেছেন :

"আমার সকল কাজ সব
তাদের জন্যেই আমি চিরদিন দি
আশা করি যতদিন বাঁচব থামব

# রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

এই মহা মানব ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে বিপুলকায় দিনপঞ্জী রখেছিলেন, তা ধীরে ধীরে প্রকাশ করা হচ্ছে। তার মধ্য থেকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অংশটুকু Ind নামে সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়েছে পৃথকভাবে। তাও সুবৃহৎ। ঐ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত দিনপঞ্জী থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত অংশটুকু এখানে সংকলিত করা হয়েছে।

রোলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবনা সম্পর্কে যাঁরাই কৌতূহলী, এই দিনপঞ্জী নিঃসন্দেহে তাঁদের আকৃষ্ট করবে। তাই এই সংকলন।

**১৯২৬ খ্রীঃ**

৪ঠা অক্টোবর। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগমন। তিনি যাহার জীবনীকার সেই মহান্ হিন্দু সম্পর্কে কথাবার্তা বলিব বলিয়া তাহাকে দেখিতে আমাদের খুবই আগ্রহ। মুখোপাধ্যায়ের বইটির যে কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার ভগিনী আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাহা আমাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিয়াছি, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার তেজস্বী শিষ্য বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করা এবং ইউরোপে তাঁহাদিগকে পরিচিত করা আমার কর্তব্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন অসংস্কৃত, শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষ, কিন্তু তিনি স্বতঃ-উপলব্ধির অন্যতম অতিশক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মনে হয়,—তিনি নিজের মধ্যে সকল মহান্ ধর্মের ত্রুটিহীন একীভবনকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। আমি বলি, 'বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন।' অপর সকলের নিকট যাহা শুধু মানসিক একটা আদর্শ, বুদ্ধিগত সমন্বয়সাধনের একটা চেষ্টা, তাহাই রামকৃষ্ণ সারা জীবন সম্পন্ন করিয়াছিলেন সরাসরি সহজাত বৃত্তি ( instinct ) হইতে। সকল ধারাবর্ষী রূপের মধ্যে

তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছিলেন। এবং যাঁহারাই তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্ধারে তাহা বিকিরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। যে অলৌকিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা তাঁহার আয়ত্ত ছিল, তাহা বিস্ময়কর মনে হয়। তাঁহার নীরব উপস্থিতি ও তাঁহার স্পর্শ বিপর্যয় ঘটাইয়া দিত। সেই যে বিদ্রোহী-সিংহ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী—এবং হাতের একটা চাপ মাত্র দিয়াই তাঁহার চোখের সম্মুখে নাস্তির যে অতলতা খুলিয়া দিয়া তিনি সম্মোহিত করিয়াছিলেন—যাহার শক্তি মহাকাব্যোচিত, সেগুলির নিশ্চিত যাথার্থ্যকে বাতিল করা যায় না। কারণ, বিবেকানন্দ যাঁহাদের নিকট তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, সেই সাক্ষীরা এখনও জীবিত আছেন ;—কারণ, সেই গর্বোদ্ধত, আধিপত্যশীল মনের অধিকারী মানুষটিকে—রামকৃষ্ণ যেখানে সাধারণ লোক, সেখানে তিনি ছিলেন অভিজাত, রামকৃষ্ণ যেখানে অমননশীল, সেখানে তিনি ছিলেন অতি-সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য অহংকারী—তাঁহাকেও দামাস্কাসের পথে পলের মতো রামকৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল।

নিজের ও শিষ্যদের কাজের মধ্য দিয়া প্রকাশিত রামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রচুর। ওকাকুরা যখন জাপান হইতে বিবেকানন্দের সন্ধানে আসিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তখন বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : "এখানে আমার সহিত আপনার করণীয় কিছুই নাই। এখানে তো সর্বস্ব পরিত্যক্ত। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান, তিনি এখনও জীবনের মধ্যে আছেন।"…

মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণের মুখে-মুখে-বলা ঐতিহ্যকে সুনির্দিষ্ট একটা রূপ দিতে চান। ভারতবর্ষে এখনও এমন তিনজন শিষ্য জীবিত আছেন যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকে জানেন। তাঁহাদের স্মৃতিকথা লিখিয়া লইবার জন্য মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিস্ময়কর প্রমাণপত্র

আত্মজীবনীমূলক দিনপঞ্জী পাইয়াছেন, সেগুলি আমাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ আরও বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ ধারণা পাইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের একজন—নামটা আমার মনে পড়িতেছে না—মুখ্য শিষ্য বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর গুরুর নিকট হইতে তাঁহার অতীন্দ্রিয় বিকিরণ-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সংস্পর্শের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে। তাঁহার স্পর্শমাত্র লাগিয়া মুখোপাধ্যায়ের একমাস কাল যাবৎ মনে হইয়াছিল—মাটির উর্ধ্বে মাতাল-করা এক আনন্দের জগতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ, জগতের সকল কিছু, লোপ পাইয়া গিয়াছে। এই শক্তি যাঁহার আয়ত্তে, তিনি তাহা ব্যবহারে সতর্ক থাকেন, তিনি বলেন: "হাত বাড়াইও না, পুড়িয়া যাইবে।" পশ্চিমের বিচারশীল মানসিকতায় অভ্যস্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন সাক্ষীর মুখ হইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার মূল্য আছে।

মুখোপাধ্যায় তরুণ, মনে হয় না যে ত্রিশের কোঠার বেশিটা পার হইয়াছেন। চীন ও জাপান ঘুরিবার পর তিনি গিয়াছিলেন আমেরিকায়; সেখানে তিনি কুলির কাজ দিয়া শুরু করেন, পরে সেখানেই পড়াশুনা করেন, ডিগ্রী নেন। তিনি আমাদিগকে সেইসব হাজার হাজার ভারতীয়দের কথা বলিলেন, যাহারা ক্যালিফর্নিয়ায় বসবাস করিত, সেখানে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তি কিনিয়াছিল, তারপর সাম্প্রতিক এক নির্মম আইনে সম্পত্তি হইতে উৎখাত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া ও পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া এই হতভাগ্য আশ্রয়হীনরা ঘেরাও হইয়া ইংরেজদের হস্তে নিহত হইয়াছিল; এবং ইহাই ছিল অমৃতসর অভ্যুত্থানের সূচনা···

বিবেকানন্দকে খোঁজার অভিযানের কাহিনীটিও তাঁহার মুখ হইতে শোনার মতো। সমস্ত ভারতবর্ষ চষিয়া বেড়াইতেছেন, এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে যাইতেছেন, এমন সময় একদিন হঠাৎ হিমালয় হইতে নামিয়া-আসা এক পথিকের চেহারা দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া

লুটাইয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন : "ইনিই কৃষ্ণ!" বিবেকানন্দ ( কারণ ঐ পথিকই বিবেকানন্দ ) কাছে আসিয়া তাঁহার কাঁধে চাপড় দিয়া বলিলেন : "আশ্চর্য! আমি কৃষ্ণ নই। আমিও তাঁহাকেই খুঁজিতেছি। যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, আমার অনুসরণ কর।"

রামকৃষ্ণের ধ্যানধারণা ভারতবর্ষে অনেক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছড়াইয়া পড়িয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে। অপর দিকে বুদ্ধিজীবীরা ইহার সম্পর্কে একগুঁয়ে মনোভাব দেখাইতেছেন। ( যদিও রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যদের অনেকেই ছিলেন বড় বড় বুদ্ধিজীবী )।—মনে পড়িল, ভারতীয় খ্রীষ্টান কে. টি. পল বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের এই একটা ধর্ম যাহার অনেক ভবিষ্যৎ আছে; এবং তিনি নিজেই ইহাকে শ্রদ্ধা করেন মনে হইয়াছিল; ফিরিয়া গিয়া রামকৃষ্ণ মঠগুলি তাঁহার দেখিবার কথা।—মুখোপাধ্যায় বলিলেন, ঐ মঠগুলির সঙ্গে ইউরোপের মঠগুলির মিল নাই; ওখানে জীবন কাটানো নিষেধ, ওখানে লোকে যায় গুরুর উপদেশ মতো নিজেকে গড়িয়া তুলিতে, কয়েক বছর ধ্যান করিতে। যখন আলো আসে, তখন তাহা নিজের জন্য রাখিয়া দেওয়ার নিয়ম নাই। দ্বারের নিকট আনিয়া দাঁড় করাইয়া বলা হয়, "তোমার মধ্যে আগুন আছে। তাহা এখন অন্যের নিকট লইয়া যাও।" বিবেকানন্দ ধ্যানের জন্য মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পাহাড় কিনিয়াছিলেন, সেখানে তিনি ব্যাঘ্রসহ জন্তু-জানোয়ারের বন্য পরিবেশটি বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, সারাদিন বাঘগুলি গর্জন করিয়া ফিরিত। সেখানে নির্মিত হইয়াছিল ছয় কি সাত জন সন্ন্যাসীর উপযুক্ত একটি মঠ, কোনমতেই বারোজনের বেশির জন্য নয়। ইহারা জমি চাষ করেন, উপাসনা করেন। ...রাত্রিতে, ব্রাহ্মমুহূর্তে সমস্ত নিদ্রিত মানুষের উপর তাঁহাদের প্রেম বিকিরণ করেন, যাহাতে তাহাদের মুক্তি হয়; ঐ সময়ে আত্মা বস্তুর বন্ধন হইতে সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন থাকে। —কিন্তু রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জীবিত বড় বড় শিষ্যের পক্ষে—যাঁহাদিগকে মুখোপাধ্যায় দেখিয়াছেন—পুণ্যের আদর্শকে অনুসরণের প্রশ্ন নাই। বলা হয় :

"সেবার কথা কি ভাবো, কৃষ্ণ হও। আর বাকী সবই তোমার কাছে আসিবে।"

এইটি লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় অতীন্দ্রিয়বাদীর পক্ষে (আমার বিশ্বাস, যেমন ইউরোপের প্রাচীন অতীন্দ্রিয়বাদীদের পক্ষেও)—আলোকলাভের সর্বশেষের আগের স্তর হইতেছে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা, এ সংসারে বাঁচিয়া থাকায় অরুচি—এবং প্রেমে পৌছিবার ও তাহা ছড়াইবার প্রয়োজনে ছড়াইয়া যাওয়া।...ইহাই ঘটিয়াছিল রামকৃষ্ণের সেই শিষ্যের* ক্ষেত্রে। গুরুর মৃত্যুতে তিনি হতাশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন: "সব শেষ। আমার কাছে জীবন বলিয়া আর কিছুই নাই।" এবং তিনি হিমালয়ে নির্জনবাসে গিয়াছিলেন। সেখানে দশ বছর ছিলেন। দশ বছর শেষে বিদ্যুৎ চমকিত হইল! মানুষের ভালোবাসা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলো ছড়াইতে ফিরিয়া আসিলেন।

গান্ধী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মাধুর্যে প্রভাবিত হইয়াছেন। এই জীবনটির ইতিহাসের অপেক্ষা দিব্যতর কিছু তাঁহার জানা নাই।— মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা করিলাম, কী কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে গান্ধী তাঁহার জীবনী লিখিতে (যাহা মুখোপাধ্যায় লিখিতে চাহিয়াছিলেন) তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস (আর আমি যাহা বলিলাম তাহাতে মুখোপাধ্যায় অবাক হইলেন), গান্ধী সচেতন যে, তিনি ঐ উপাদানের দিব্য মানুষ নন (যাহা তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখিতে পান) এবং ভক্তেরা তাঁহার উপরে তাহাই আরোপ করায় তিনি আঘাত পান। গান্ধীজী গোঁ-ভরে আপত্তি জানান। তিনি নিজে নিজের জীবনী লিখিতে উদ্‌গ্রীব, যাহাতে তিনি নিজেকে ছোট করিয়া দেখাইতে পারেন, প্রমাণ করিতে পারেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ, তাঁহার মধ্যে দিব্য কিছুই নাই। আর এইজন্যই—তিনি চান বা না চান—তিনি একজন

---

* ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়-বর্ণিত সেই শিষ্যটির নাম রোলাঁ স্মরণ করিতে পারেন নাই।

সন্ত ( মহাপুরুষ )। কিন্তু সন্ত আর দেবতা বা অর্ধদেবতার মধ্যে ব্যবধান আছে। সন্ত আমাদের মানবতার অন্তর্ভুক্ত। দেবতা থাকেন অন্য ভূমিতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সকল বড় বড় ব্যক্তিই, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাঙ্গালী। এবং মুখোপাধ্যায়ও বাঙ্গালী।

৫ই অক্টোবর। মুখোপাধ্যায় আমাকে একটি উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখিয়াছেন।...

...মুখোপাধ্যায় শিশুকালে বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতে পারেন।

## ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৩ই মে। মিস্ জোসেফিন ম্যাকলেঅডের আগমন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার ( মার্গারেট নোবল ) অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অনেক মাস—প্রায় এক বৎসর—মুখোপাধ্যায়ের আগমনের পর হইতে আমি ও আমার বোন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রায়-পৌরাণিক ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত আমাদের যোগাযোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন। মিশন মিস্ ম্যাক্লেঅডের মাধ্যমে প্রায় গোটা একটা গ্রন্থাগার পাঠাইয়াছেন। আর আমার বোন সেগুলি বারবার করিয়া পড়িয়াছেন। প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। ইউরোপে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিতে মিস্ ম্যাক্লেঅড আগ্রহী হইয়াছেন।

ভদ্রমহিলা আমেরিকান, বছর ষাট বয়স, সাদা চুল, লম্বা, রোগা, মুখে বলিরেখা, কিন্তু খুবই প্রাণবন্ত, প্রখর বুদ্ধিমতী, মনটি উদগ্র ও কৌতূহলী, বাক্পটুতার সহিত বেশ ভালো ফরাসীতে কথা বলেন, না

থামিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চলিয়া যান। তিনি ধনী, মার্জিতরুচি। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়াছেন; যাঁহারা আগ্রহ জাগাইবার যোগ্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ( তাঁহাকে দেখিয়াছেন মার্চের প্রথম দুর্ঘটনার কুড়ি দিন আগে), অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি সকলকে তিনি সেখানে জানিয়াছেন, কিন্তু সর্বাধিক জানিয়াছেন বিবেকানন্দকে, যিনি হইয়া আছেন তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাস, তাঁহার আবেগ। অবশ্য, তিনি নিজেকে যতোই তাঁহার ( বিবেকানন্দের ) প্রত্যাদেশে দৃঢ় বিশ্বাসী বলুন না কেন, তিনি কখনও তাঁহার ( বিবেকানন্দের ) মিশনে প্রবেশ করেন নাই, অন্যান্য অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মতোই তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; এবং আমার সন্দেহ, তাঁহার বিশ্বাসে নারীসুলভ পল্লবগ্রাহিতার কিছু মিশল রহিয়াছে, যাহাতে প্রবল অনুরাগী হইয়াও এইসব অত্যাশ্চর্য ব্যাপারে তিনি প্রচুর কৌতুক বোধ করেন।

তাঁহার কথাবার্তা লিখিয়া রাখা কঠিন, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাঁহার লাফাইয়া চলা থামে না। তাঁহার মতো করিয়াই বলিতেছি, এলোমেলোভাবে লিখিতেছি।

আমেরিকায় তিনি বিবেকানন্দকে ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জানিতেন। ইংলণ্ডে আবার তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার সহিত ( তখন ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন মার্গারেট নোবল, লণ্ডনে এক স্কুলের পরিচালিকা )। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবেকানন্দের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁহাকে ভারতবর্ষ চিনাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের তীর্থভ্রমণে তিনি বিবেকানন্দের পিছু ধরিয়াছিলেন। আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন মাস আগে আবার তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করেন না যে, বিবেকানন্দের অসুস্থতার কোন লক্ষণ ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন বা বিশ্বাস করিতে চান যে, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই বিবেকানন্দ মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন; একমাত্র এই কারণে যে, তিনি

তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছিল। মৃত্যুর দিনটির মতো এমন সবল তিনি আর কখনও ছিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাঁটিয়াছিলেন, শিষ্যদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের সন্ধানে যদি অটল থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অমর। কিন্তু যদি সে রাজনীতি ও সামাজিক সংঘাতে নামে, তাহা হইলে মরিবে।"—সেদিন সন্ধ্যায় তিনি নির্জনে ছিলেন এবং সমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি বসিয়া ছিলেন, এক শিষ্য তাঁহার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন; তিনি তাঁহার শ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আর ফেলেন নাই; তবুও অনেকক্ষণ ধরিয়া বুক ধুকধুক করিতেছিল; অবশেষে তাহা থামিয়া গিয়াছিল (৪ঠা জুলাই, ১৯০২)।

তাঁহার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও বিচ্ছুরিত আকর্ষণ-শক্তি সম্পর্কে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের বলা শেষ হইতেই চায় না। এক মল্লবীরের শক্তি মিশিয়াছিল মাধুর্যের সহিত। শক্ত চোয়াল, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। তাঁহার বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর তাঁহার সাফল্যকে অর্ধেক নিশ্চিত করিয়া দিয়াছিল। চেলোর মতো সুন্দর কণ্ঠস্বর, একটু গম্ভীর, মন কাড়ে, সাড়া জাগায় (রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর হইতে খুবই পৃথক, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ওঠে খুব উঁচুতে), চড়ে না, কিন্তু তাহার গম্ভীর স্পন্দনে ঘর ও শ্রোতার মন গমগম করিয়া উঠে, আর শ্রোতা যখন মুগ্ধ হয়, তখন তিনি কণ্ঠস্বরকে ধীরে ধীরে সমে নামাইয়া আনেন, এইভাবে শ্রোতাকে টানিয়া লইয়া যান মনের গভীরতম প্রদেশে। এক আশ্চর্য যোগাযোগে ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠস্বরও ছিল ইহারই সগোত্র।

কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বা আড়ষ্টতা ছিল না। এক নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্তি। তাঁহার সান্নিধ্যে সকলেই সহজ বোধ করিত। কারণ, আগ্রহ, আনন্দ, বয়স্ক-শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য লইয়া তিনি সকলের সহিত যোগ দিতেন। তিনি ছিলেন রঙ্গরসে ভরপুর,—(অনেক মহান্ ভারতীয়ের মতোই)। বলিতেন, ঈশ্বর-সন্ধানে রঙ্গরস প্রয়োজন,—রঙ্গরসের পথে না থাকিলে, যে

ঈশ্বর সন্ধান করে, সে খাটিয়া মরিবে। বিবেকানন্দের মতোই, এবং তাঁহার চেয়েও বেশি, এই গুণ ছিল রামকৃষ্ণেরও; এই যে মানুষটি দেবত্বের ও তাঁহার উপাস্যদের সকল রূপে নিজেকে পরিবর্তিত করিতেন ( যাহা এমন স্তরে যাইত যে, নিজেকে নারী মনে করিতেন, বা কালীর মতো হইবার জন্য নারীর মতো বেশও ধারণ করিতেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার রঙ্গরসে স্রষ্টার গুণ ছিল এবং তিনি ( সাধক, সাধিকার ) রঙ্গরসাত্মক অনুকরণ করিয়া আনন্দ পাইতেন ; তারপর মুহূর্তকাল পরেই হঠাৎ আবেশের ঘোরে পড়িতেন )। বিবেকানন্দও স্বভাবে ছিলেন শিল্পী।—তিনি বলিতেন ; "দেখিতে পাও না, সবার আগে আমি কবি ?" ( আমাদের ইউরোপের লোকে কথাটা এতো ভুল বোঝে, কারণ এই কাব্যের সহিত যে একই সময়ে এক অটল বিশ্বাস জড়িত থাকে, তাহা তাহারা ভাবিতেও পারে না। )

ইউরোপের তর্কবিদ্যা, কর্ম ও চিন্তার নিরন্তর যান্ত্রিকীকরণ, 'সংগঠিত' করিবার দাবি করিয়া যাহা তাহাদিগকে প্রস্তরীভূত করিয়া তোলে—বিবেকানন্দ তাহার জাতশত্রু ছিলেন। তিনি চাহিতেন অন্তর-প্রবাহের নিরন্তর স্বাধীনতা ; তিনি স্ববিরোধিতাকে ভয় করিতেন না। বিরোধিতায় ভরা ছিল তাঁহার কথাবার্তা। তিনি তাহা জানিতেন, আর তাহা লইয়া বড়াইও করিতেন। গতকাল এ কথা বলিয়াছেন বলিয়া অনুযোগ করা হইলে অন্যের মতোই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন ঃ ঠিকই তো। কাল ছিল কাল। আজ আমি আগাইয়া গিয়াছি। জীবন একই জায়গায় কখনও স্থির থাকিতে পারে না। মিস্ ম্যাকলেঅড বলিলেন ঃ "গীতার মতো তিনি ছিলেন বিরোধিতায় ভরা। তিনি ছিলেন মূর্তিমান্ গীতা।" —ক্রীতদাসের মনোভাব তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন ঃ "অসুরের পথ হইয়া উঠিলেও তোমার পথ ধরিয়া চলো, কিন্তু তাহা তোমার পথ হওয়া চাই। পাপ সম্পর্কে পিউরিটানি বা খ্রীষ্টানি পেয়ে-বসা মনোভাব তিনি ( রামকৃষ্ণের চেয়ে বেশি নয় ) সহিতে পারিতেন না। নিজের লোকজনদের নিকট তিনি সামগ্রিক স্বচ্ছতা দাবি

করিতেন।—"নিজের দোষগুলিকে ভালো করিয়া জানো, তাহাদের চোখে চোখে ভালো করিয়া তাকাও। তারপর আগাইয়া চলো। অতীতকে পেছনে ছুঁড়িয়া দাও!"—সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ: স্পষ্ট মন আর সক্রিয় কর্মশক্তি।

রামকৃষ্ণের মতো তিনি সন্ন্যাসীদের নিকট আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতার চরম প্রয়োজনের কথা বলিতেন। ভারতবর্ষে চালু কথা আছে, বারো বছর যে আন্তরিকতার সঙ্গে সাধনা করে, সে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বলার গুণ পায়। এবং রামকৃষ্ণ বলিতেন (বিবেকানন্দ বারবার বলিতেন), চরম যৌন সংযম এক বিপুল শক্তি, এই নিয়মানুবর্তিতার বারো বৎসরের শেষে মানুষের স্বভাবে এক নূতন শৃঙ্গোদ্‌গম হয়, যাহা তাহাকে ঈশ্বরকে ভেদ করিবার যোগ্যতা দেয়। যিনি ঈশ্বরকে স্বামিত্বে বরণ করেন, তিনি কামজ সন্তানোৎপাদনের সমতুল্য শক্তি ধারণের অধিকারী হন। অবশ্য, একটা অপরটাকে বাতিল করিয়া দেয়। ভারতবর্ষে যাজকরা কম শ্রদ্ধেয় এই কারণে যে, তাঁহারা বিবাহ করেন। তাঁহাদের এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, সন্ন্যাসীরাই সত্যকার ঈশ্বরের জন।

মনকে যাহা কিছু পদানত করে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার বিশ্বাস ঘোষণা সত্ত্বেও—যেসব ফলপ্রসূ বিরোধিতার ব্যবহার ও অপব্যবহারে বিবেকানন্দ অভ্যস্ত ছিলেন সেগুলিরই একটির ফলে—তিনি পশ্চিমের শৃঙ্খলাবোধের গুণাবলী গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার সন্ন্যাসীদের উপরে তাহা চাপাইয়া দিতে শিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের কঠোর শৃঙ্খলা, এবং অপরকে, দরিদ্রকে, রুগ্‌ণকে, দুঃখীকে সেবা করার বাধ্য-বাধকতা: ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসে এটাই ছিল তাঁহার বিরাট অভিনবত্ব।

কার্যত, একটি বাহিনী তাঁহার কাজ আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। শুধু বেলুড়েই তিন শতের কাছাকাছি সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদের অনেকেই এখনও জীবিত। সারদানন্দ আছেন কলিকাতার কাছে বেলুড় মঠে; তিনি বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ

জীবনী লিখিয়াছেন ;—শিবানন্দ মঠের অধ্যক্ষ ;—যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে, অভেদানন্দ আছেন হিমালয়ের অদ্বৈতাশ্রমে ; আর আছেন ভগিনী ক্রিস্টিন (জন্মসূত্রে জার্মান)—সেরা ব্যক্তিত্ব, ভগিনী নিবেদিতার তুল্য, দিব্যচেতনায় নিঃশেষিত, জরাজীর্ণ ; আর তাঁহার উপরে ভ্রাতৃসুলভ সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র, বিবেকানন্দের শিষ্য ভক্ত তরুণ পণ্ডিত বশী সেন, যিনি সেই মঠে বারো বৎসর হইল এক ল্যাবরেটরি বসাইয়াছেন।

মিস্ ম্যাক্লেঅড ভগিনী নিবেদিতাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানিতেন, ভারতবর্ষে থাকার গোড়ার দিকে নিবেদিতা তাঁহার কাছে আট মাস ছিলেন। লণ্ডনে যখন নিবেদিতা মার্গারেট নোবল ছিলেন এবং বিবেকানন্দ তাঁহার স্কুলে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি প্রতিটি বক্তৃতার পর বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া বলিতেন : "ঠিকই বলেছেন, স্বামীজী, কিন্তু···।" তিনি চিরদিন তর্ক করিতেন, প্রতিরোধ করিতেন, এবং তাঁহার প্রতিরোধ হইয়াছিল দীর্ঘ। কিন্তু যখন তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন, করিলেন চিরদিনের জন্য। (এই প্রকার জয় করার উপযুক্ত অনেক ইংরেজ মনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দ ; একবার জয় করা হইলে তাঁহারা সমস্ত পরীক্ষায় বিশ্বস্ত থাকিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের এক গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি বলিতেন, ইংলণ্ডে আসার আগে তিনি ইংরেজদের অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে জানার পর হইতে তিনি তাঁহাদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছেন : কোনো মনই যথেষ্ট নিশ্চিত নয়!) মিস্ ম্যাক্লেঅড বেশ ভালভাবে অনুমান করিতে পারেন নাই যে, মার্গারেট নোবলই স্বামীজীর সর্বাধিক অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একজন হইবেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিলে তাঁহার কাছে যখন মার্গারেট নোবলকে আসিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে সময়কার বিস্ময়ের কথা বলিলেন। তিনিও নূতন আসিয়াছেন ; মুখটা ফোলা, মশার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু আনন্দে উদ্ভাসিত। সেই

সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার মায়ের সঙ্গে তাঁহার এক অদ্ভুত ও অন্তরঙ্গ আলোচনার কথাও বলিলেন। নিবেদিতা ছিলেন এক ধর্মযাজকের কন্যা, তাঁহার শৈশব ছিল বেদনাদায়ক। মনে হয় মার নিকট হইতে তাঁহার দূরত্ব ছিল অনেক, এবং মায়ের মনটা ছিল অগভীর। একদিন তিনি মিস্ ম্যাক্‌লেঅডকে একা পাইয়া তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে যে-কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কখনও তিনি তাঁহার মেয়েকে বা বিবেকানন্দকে বলেন নাই—"যখন প্রথম গর্ভবতী হলাম, তখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, মানত করেছিলাম, যদি সব ভালোয় ভালোয় হয়, তবে আমার সন্তানকে আমি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করব। আমার মেয়ে বা অন্য কেউ কখনো সেকথা জানেনি। যখন ২৮ বছর বয়সে মেয়ে এসে বলল, সে স্বামীজীর শিক্ষামতো চলতে চায়, আমি দেখলাম ঈশ্বর কথা বলেছেন, আমি তাঁকে সব দরজা খুলে দিলাম।"—( ভগিনী নিবেদিতা কখনও ইহা জানিতে পারেন নাই ঃ তাই তাঁহার মায়ের সম্মতি তিনি নিজের কাছে কখনও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। )

রামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদাদেবীকেও মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বেশ জানিতেন। পাঁচ-ছয় বৎসর হইল সারদাদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ( বাঁচিয়া থাকিলে রামকৃষ্ণ ঠিক আমার বাবার বয়সী হইতেন।) মিস্ মেক্‌লেঅডের ভাষায়, সারদাদেবী ছিলেন পুরোপুরি এক বিশিষ্টা রমণী, যে-কোন ব্যাপারেই ইউরোপীয় রমণীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তিনি একাত্ম হইতে পারিতেন এবং সারল্য, সুষমা ও স্বাভাবিক মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতোই তিনি গোঁড়ামি হইতে দূরে থাকিয়া, ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিয়া ইউরোপীয় বান্ধবীদের পরিচর্যায় সানন্দে আগ্রহী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মহৎ মূল্য তাঁহার নিজের গ্রামে ছিল অজ্ঞাত, কোনো অসাধারণ আচরণের মধ্য দিয়া সেখানে তিনি বিশিষ্টতা দেখান নাই।—ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের ধারণা খুব উঁচু; তাঁহার মতে, সাধারণভাবে পুরুষদের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক উচ্চে এবং তাঁহাদের এমন এক মর্যাদা, স্বার্থত্যাগ

ও সক্রিয়তা আছে—যেগুলির মধ্যে কোনো বিরোধিতা ঘটে না। যে সন্ন্যাসীরা, যে সাধুরা সারদাদেবীকে জানিতেন, তাঁহারা প্রায় সব সময়েই বাবার অপেক্ষা তাঁহাদের মাকেই বেশি সাক্ষী মানিতেন।

কিন্তু মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বলিলেন, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষকে না জানিলে এবং তাহার ভাষায় তাহার পরিবেশের আস্বাদ না পাইলে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে জাগাইয়া তোলা প্রায় অসম্ভব। চোখের সম্মুখে তিনি হাজার হাজার ঈশ্বর-পাগলের ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন, যাঁহাদিগকে দেখা যায় পথে-ঘাটে, উলঙ্গ ও ভস্মমাখা, ঈশ্বর-মাতাল, ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন বা মার্গানুযায়ী ঈশ্বরকে অনুসরণ করিতেছেন।

[ রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় ব্যাপার ঃ—কাহারও নিকট তাঁহার এমন কোনও ভালো প্রতিকৃতি নাই, যাহাতে তাঁহার প্রাণশক্তি ও মধুর হাসির সহিত দৈনন্দিন জীবনের মতো করিয়া তাঁহাকে দেখানো হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র যে ফটোটি রক্ষিত আছে, তাহা তোলা হইয়াছিল (তাঁহার অসন্তোষ ঘটাইয়া) যখন তিনি সমাধিতে মগ্ন ছিলেনঃ তাহা হইতেই তাঁহার এই ব্যাদিত মুখ, এই ঈষৎ হাবা-গোবা, খেপাটে চেহারা। তাহা ছাড়া নিচের ঠোঁটটা বিকৃত,—ফোলা, তাহা হইয়াছে সমাধির সময়ে আগুনের মধ্যে পড়ার ফলে,—কারণ, সবাই জানে তিনি সর্বদা আবেশের মধ্যে থাকিতেন। রোদে খড়ির দাগ দেখা মুরগির ছানার মতোই (শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিতেছি) তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। অসাধারণ এই যে, এই নিরন্তর আবেশে ঢলিয়া পড়ার সঙ্গে তাঁহার প্রখর জ্ঞানের নিরন্তর ভারসাম্যকে তিনি মিলাইতে পারিতেন।—কিন্তু ইহা কোনো ইউরোপীয় যুক্তিবাদী কখনও মানিয়া লইবে না। ]

১৪ই মে। (নূতন আলোচনা)

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড আমেরিকান, বড়োই ভাসা-ভাসা। কিন্তু নিজেকে

বড়ো মনে না করিবার বা নিজের উপরে কোনো ক্ষমতা আরোপ না করিবার মনটি আছে। বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল; তাঁহাকে হাসি-খুশি রাখা, তাঁহাকে লইয়া মাতিয়া থাকা ছাড়া অন্য কাজ তাঁহার ছিল না। তিনি তাঁহার জীবনের স্বাধীনতা কিছুতেই কখনও ত্যাগ করেন নাই এবং বিবেকানন্দ ও তাঁহার মধ্যে এ সম্পর্কে বোঝাপড়া ছিল,—যদিও তিনি বলেন, তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে জানার পর হইতে সব সময়েই তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরকে —বিবেকানন্দের ঈশ্বরকে—অনুভব করেন। কিন্তু এই ঈশ্বরের সেবায় নিজের নাম লিখাইবার দাবি তিনি করেন নাই। এ ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করেন। এইসব কথা তিনি মুখে মুখে অন্যদের বলেন, যাহাতে এগুলি তাহারা কাজে লাগায়, আর কাজের লোকদের যখন দরকার হয়, তখন তাহাদিগকে টাকা দিতে ভালোবাসেন। তাঁহার এক মার্কিনী বাতিক হইল—অর্থের গুণকীর্তন করা এবং এই অন্য দেবতাটির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কাজের (আমাদের মনের পক্ষে স্থূল) একটু বেশি রকম পুনরাবৃত্তি করা,—২১ এই স্বাভাবিক ও সহজ ঔদার্য তাঁহার সেই বাতিকের দোষটা কাটাইয়া দেয়।

তিনি ৭ বৎসর ধরিয়া বিবেকানন্দকে জানিয়াছিলেন, এবং মাসের পর মাস তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, আদরযত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁহার কাছে নিজেকে অপরিহার্য করিয়া তোলেন নাই। ইউরোপে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার পর, তিনি না লেখা পর্যন্ত লেখা হইতে এবং না ডাকা পর্যন্ত সেখানে তাঁহাকে দেখিতে আসা হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়াছিলেন। তাহা করার পরে তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আসিতে পারেন কি না। বিবেকানন্দ এই উত্তর দিয়াছিলেন :

—"যদি দারিদ্র্য, অধঃপতন, নোংরামি, ঈশ্বরের কথা-বলা নেংটিপরা মানুষদের দেখিতে চান, তাহা হইলে আসুন! কিন্তু যদি অন্য কিছু চান আসিবেন না। কারণ কাহারও সমালোচনা আমরা সহিতে পারিব না।"

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বলিলেন, এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়াছিলেন। যখনই বুঝিতে পারিয়াছেন মনে সমালোচনা জাগিতেছে, তখনই সরিয়া গিয়াছেন।

মাসের পর মাস তাই বিবেকানন্দ তাঁহার বাড়িতে থাকিয়াছেন—আর থাকিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব না থাকিলেও। কোনো কোনো দিন দেখিতেন বিবেকানন্দ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না—(বাহিরে বৃষ্টির দুর্ভেদ্য যবনিকা)—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের এ কোণ হইতে ও কোণে পায়চারি করিতেছেন,—আর কথা বলিতেছেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বলিলেন, এই কথা বলিবার সময়ে বিবেকানন্দ যে বদলাইয়া যাইতেছেন, তাহা তাকাইয়া দেখাটা-ও রোমাঞ্চকর। পর্যায়ক্রমে তিনি চলিয়া যাইতেছেন তাঁহার তিনটি দশায়—বহুরূপ সত্তার তিনটি অবস্থাঃ জ্ঞানের দশা, ভক্তির দশা ও কর্মের দশা— একটা হইতে অন্যটায়।—দুঃখের বিষয়, এই বিস্ময়কর কথাগুলি তিনি বলিলেও পরে আবার স্মরণ করিতে সমর্থ বলিয়া তাহাকে মনে হইল না। শুধু ছাপটুকুই তাঁহার মনে আছে।

তিনি বলিলেন, বিবেকানন্দ বেশির ভাগ সময়ই ছিলেন কিশোর-সুলভ অতিশয় হাস্যচপল,—(তাই তিনি একদিন তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'স্বামীজী, আপনি ধর্মপ্রবণ লোক নন',—বিবেকানন্দ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিলেনঃ "আমিই ধর্ম।")—কিন্তু কোনো কোনো দিন ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর দুর্দশা তাঁহাকে কিভাবে বিদ্ধ করিত; তিনি গভীর ও নিঃশব্দ বেদনার ভারে নুইয়া পড়িতেন, যাহা হইতে কিছুই তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে পারিত না। অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেন।—মহান্ ভারতীয় মানুষদের সেই বিস্ময়কর জীবনীশক্তিপূর্ণ নমনীয়তার সঙ্গেই কেবল তিনি এক দশা হইতে অন্য দশায় চলিয়া যাইতে পারিতেন—'তিনি আবেগদীপ্ত বক্তৃতা হইতে (যেখানে তিনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন) ফেরার পথে সাদামাটা জিনিসের কথা, রান্নার কথা (কারণ তিনি পাকা রাঁধুনি

ছিলেন) বলিয়া তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসিনী শ্রোত্রীকে লজ্জিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিতেন।

ভারতীয়দের মধ্যে যাহা আমাদের সর্বাধিক বিস্মিত করে (এবং ক্যাথলিকদের অপেক্ষা বেশি করে প্রোটেস্ট্যান্টদের), তাহা হইতেছে তাহাদের ধর্মীয় চিত্রদর্শনগুলিকে মূর্ত করিয়া তুলিবার ঐকান্তিকতা। ঈশ্বরকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না; তাঁহাকে দেখেন, তাঁহার কথা শোনেন এবং বাস্তব কিছুর মতো তাঁহাকে স্পর্শ করেন। রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেন?" রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন: "তোকে যেমন দেখছি, তেমনি তাঁকে দেখি, তবে আরও ভালো করে।" আর এই কথার সঙ্গে যোগ করিয়াছিলেন, "বৈদান্তিক অর্থে নয়।" (তার অর্থ নৈর্ব্যক্তিক বা বিমূর্ত অর্থে নয়)।—মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে বুকে, গলায় হাত দিয়া রামকৃষ্ণ শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "তিনি (ঈশ্বর) এইখানে।" এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ করিয়াছিলেন, "বৈদান্তিক অর্থে নয়।"

ইহা আদৌ দুই-চারিজন প্রত্যাদিষ্টের বিশেষ অধিকার নয়। আন্তরিকভাবে ভক্তিমান্ প্রতিটি ভারতীয়ই এই অবস্থায় পৌছেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড নেপালের মাধুর্যময়ী তরুণী রাজকুমারীর সহিত ছিলেন, তাঁহার সহিত মন্দিরে ঢুকিয়া তাঁহাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য নিস্তব্ধতা, ছায়া (সেখানে একটামাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল) আর ধূপধূনার গন্ধের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তরুণীটি বাহির হইয়া আসিয়া শান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "আমি রামকে দেখিলাম।"

এই বিশ্বাসীদের এবং আমাদের ক্যাথলিকদের মধ্যে তুলনীয় অনেক কিছুই আছে। বিবেকানন্দ তাহা ভালো করিয়াই দেখিয়াছেন ও বলিয়াছেন।

চিকাগোর ধর্মসভায় যখন বিবেকানন্দ (তখন অপরিচিত) প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তখন তিনি যে রেখাপাত করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই

প্রচণ্ড। তাঁহার প্রথম কথা—"আমেরিকার ভাইয়েরা ও বোনেরা"—শুনিয়াই কয়েকজন শ্রোতা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতোই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবং যখন বক্তৃতা শেষে মহাসভা হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন এক জনতা তাঁহার পিছু-পিছু চলিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন: "এই তরুণ যদি এখন জয়ের নেশাকে দমন করিতে পারেন, তবে ইনি মহান্‌···।" তাঁহার উৎসাহী ভক্তরা একটি ছোট দলে মিলিত হইয়াছিলেন, তিনি সেখানে বক্তৃতা দিতে আসিতেন। প্রথম দিকে জন বারোর বেশি হইবে না, সেই জন বারোর মধ্যে দশ-এগারোজনই মহিলা। কিছুকাল পরে তাঁহাদের একজন বলিলেন, "এই কথাগুলি হারাইয়া গেলে দুঃখের ব্যাপার হইবে। একজন স্টেনোগ্রাফার আনা দরকার। সেজন্য বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল অত্যধিক পারিশ্রমিক দিয়া গুডউইনকে (ইংরেজ)। সপ্তাহ না যাইতেই মন্ত্রমুগ্ধ গুডউইন পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকার করিলেন এবং স্বামীজীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিলেন। তিনি হইয়াছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সহায়ক। দুঃখের কথা, ভারতবর্ষে আসিবার কিছু পরে এনট্রাইটিসে ২৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বিবেকানন্দের পক্ষে ইহা ছিল একটি প্রচণ্ড দুঃখ ও অপূরণীয় ক্ষতি। (কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাঁহার প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাত আমেরিকার অন্যান্য শিষ্যদের বিশেষ করিয়া স্বামী কৃপানন্দের (পূর্বনাম লেয়ন ল্যাণ্ডস্‌বার্গ, রুশ-ইহুদী) ঈর্ষা জাগাইয়াছিল।

তাঁহার অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে: ফরাসী মারি লুইজ (আমেরিকায়) অভয়ানন্দ হইয়া কোনো চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না: তিনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন: কিন্তু সেখানে মোটেই থাকেন নাই, সেখানে তিনি যে অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, তাহাতে হতাশ হইয়াছিলেন মনে হয়।

হেন্‌রিয়েটা মূলার স্বামীজীর সহিত সুইজারল্যাণ্ডে (জেনেভা ম ঁত্র ইত্যাদি) গিয়াছিলেন এবং বেলুড়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী ক্রিস্টিন—প্রকৃত নাম মিস্ গ্রিন্‌স্টেইড—ছিলেন আমেরিকান, জন্মসূত্রে জার্মান।

শ্রী ও শ্রীমতী সেরভিয়ের ছিলেন বিবেকানন্দের সেরা বন্ধু। বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে জানিয়াছিলেন ইংলণ্ডে; সেরভিয়ের ছিলেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্‌টেন। তাঁহারা ছিলেন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। এক বক্তৃতার পর বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীসেরভিয়েরের সহিত যখন তিনি আলাপ করিতেছিলেন, তখন সেরভিয়ের তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "এই তরুণকে আপনি জানেন? উহাকে যাহা মনে হয়, উনি কি তাহাই?" মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বলিয়াছিলেন: "হ্যাঁ।" সেরভিয়ের বলিয়াছিলেন: "তাহা হইলে তো উহাকেই অনুসরণ করা, উহার সঙ্গেই ঈশ্বরের সন্ধান করা আবশ্যক।" স্ত্রীর কাছে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "স্বামীজীর শিষ্য হইতে আমাকে অনুমতি দিবে?"—স্ত্রী বলিয়াছিলেন: "জানি না।" নিজেদের যা সামান্য টাকা-পয়সা ছিল তাহা তুলিয়া লইয়া তাঁহারা স্বামীজীর সহিত ভারতবর্ষে রওনা হইয়াছিলেন। (বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁহাদের টাকা-পয়সা সবটা তাঁহার কাজে দিতে দেন নাই।) উপাসনা ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার জন্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত কর্ম ও কেন্দ্রের জন্য, হিমালয়ে মায়াবতীতে অদ্বৈতাশ্রম গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহারা নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ৫৪ বৎসর বয়সে সেখানে সেরভিয়েরের মৃত্যু হয়, তখন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ছিলেন না। বছরের প্রায় সব সময়েই দুর্গম পাহাড়ে মায়াবতীতে একমাত্র ইউরোপীয় শ্রীমতী সেরভিয়ের ১৫ কি ১৯ বছর শিশুদের শিক্ষা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি মানসিক ক্লান্তি বোধ করিতেন না?" তিনি শুধু উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি তাঁহাকে (স্বামীজীকে) ভাবিতাম।"—তারপর তিনি

বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ইংলণ্ডে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন।

প্রথম বারের সফরে আমেরিকা বিবেকানন্দের মনে বিরাট আশা জাগাইয়াছিল। তখন তিনি তাহার মধ্যে কেবল মহৎ ও শ্রেয়কেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল তাহার আপাতঃগণতান্ত্রিক সাম্য—যাহার ফলে ট্রামের মধ্যে কোটিপতির শ্রেণীর ও সাধারণ শ্রেণীর মেয়েদের ধাক্কাধাক্কি সম্ভব হইত।—কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বারের সফরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক দোষত্রুটি ও জাতিগত ঔদ্ধত্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। তিনি মিস্ ম্যাক্‌লে-অডকে বলিয়াছিলেনঃ "তাহ'লে আমেরিকা, সে-ও! এখন সে নয়; সে হ'ল চীন বা রাশিয়া—যে কাজটা সুসম্পন্ন করবে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিরাট দৈত্যের বাস্তব রূপায়ণের কথাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।)

দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সফরের সময় ফরাসী মননশীলতা ও ধর্মীয় চেতনার কোন উচ্চস্তরের প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন জ্যুল বোআ, পের ইয়াস্যাঁত্, এমা কাল্‌ভে প্রভৃতি। (যদিও মিস্ ম্যাক্‌লেঅড এমা কাল্‌ভে সম্পর্কে আপত্তি জানাইলেন, বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যে ঐকান্তিকভাবেই তাঁহার মনকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন এবং বিবেকানন্দের ইউরোপে থাকা ও মিশরের পথে ভারতবর্ষে ফেরার বেশীর ভাগ খবরই তিনি দিয়াছেন; মিশরে মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বিবেকানন্দের সঙ্গে মহা পিরামিড দেখিয়াছিলেন।)—আমার হাসি পায় যে, বিবেকানন্দ ফ্রান্সের এমন একটা চিত্র লইয়া গেলেন; আমার দুঃখ হয় যে, অত্যধিক ত্বরায়—যে ত্বরার জন্য এমন কি তলস্তয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই—তিনি এক

দৌড়ে ইউরোপ পার হইয়া গেলেন। (তলস্তয়ের পত্র হইতে দেখিতে পাই, তিনি ভারতীয় চিন্তাধারা লইয়া কতটা ব্যাপৃত ছিলেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত বিবেকানন্দের লেখা পড়িতেছিলেন।) যে প্রতিভাজাত তৎপরতা লইয়া স্বামীজী পড়ার বই গিলিতেন—তাহার কথা মিস্ ম্যাক্লেঅড, এবং তাঁহার অন্য ভক্তরা অনেক কথা বলেন, গোটাটা জানিবার জন্য পাতাগুলি উল্টাইয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতেন। আমার আশঙ্কা, এই জন্যই যেন ইউরোপীয় চিন্তার গভীরে তাঁহার প্রবেশ ঘটে নাই। এবং ইহা একটা বিশ্রী ফাঁক যে (অন্য অনেক এশীয়েব মতোই) তলস্তয়ের মহান্ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নাড়া না খাইয়াই তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন,—মরিতে পারিলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, গান্ধীবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ মিশন কি ধারণা পোষণ করেন।—স্বামীজী নিজেকে তাহার বাহিরে রাখেন। রাজনৈতিক সকল কিছুকে এড়াইয়া চলেন। একমাত্র ধর্ম ও সেবার ব্যাপারেই তিনি থাকেন। তাঁহার সমাজসেবার কাজগুলি ইংরেজ সরকার সুনজরেই দেখে,—(একবার অবশ্য তাঁহাকে পরোক্ষ-ভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিল যে, ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা মিশনের নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেছে। এখানে তিনি একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—কাজটার ফল ভালো না মন্দ? ভারতবর্ষের বড়লাটকে দিয়া এক প্রকাশ্য প্রশংসাপত্র বাহির করাইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ছিল বেলুড়মঠের জন্য ৫০০ টাকার অনুদান।)—তাঁহার লক্ষ্য বর্তমান রাজনীতি ও কাজকর্ম ছাড়াইয়া। তিনি একগুঁয়ের মতো লাগিয়া আছেন ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব রূপায়ণের জন্য,—বিবেকানন্দ এইটাই চাহিয়াছিলেন এবং ইহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যাহাকে হইতে হইবে নবীভূত ভারত ও পৃথিবীর কর্মকেন্দ্র।

বলা হইয়া থাকে, রামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের অতীত তিন হাজার বছরকে মূর্ত করিয়াছেন এবং বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে আগামী তিন হাজার বছর। মিস্ ম্যাক্লেঅড একদিন সারদা দেবীকে ( রামকৃষ্ণ-পত্নীকে ) বলিয়াছিলেন ঃ "আপনার স্বামীর ভাগে পড়িয়াছিল ভালো দিকটা ; শুধু ভারতবর্ষে, তাঁহার নিজের লোকের মধ্যেই তাঁহাকে কহিতে হইয়াছে কথামৃত ; তাহা তাঁহার কাছে ছিল পরিপূর্ণ আনন্দও। বিবেকানন্দের দৌত্য ছিল অনেক বেশি কঠিন ; বিদেশী ও বিরূপ লোকদের মধ্যে তাঁহাকে হইতে হইয়াছে ভারতীয় চিন্তার বাহক , তাঁহার অংশটা ছিল সর্বাধিক বীরত্বপূর্ণ।"—সারদা দেবী অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিয়াছিলেন ঃ "ঠিকই, সে ছিল সকলের চেয়ে বড়ো। উনি বলতেন, উনি দেহ আর বিবেকানন্দ মাথা।"

বিবেকানন্দের দুই ভ্রাতা এখনও জীবিত আছেন। একজন লিখেন, একজন নৃতত্ত্ব লইয়া থাকেন। তাঁহার অহংকার আছে, ভাইয়ের নাম তিনি ভাঙাইতে চান না ; নিজের জোরেই শ্রদ্ধেয় হইতে চান।

১৬ই মে ॥ ( নূতন আলোচনা। )

ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণে বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০টি মঠ, ২০০ হইতে ৩০০ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে। কিন্তু সম্প্রদায়ে ভর্তি করা হয় একচেটিয়াভাবে বাঙ্গালীদের।—সাধারণতঃ মহামারীর সময়ে চিকিৎসালয় দিয়াই শুরু করা হয়। তারপর দেশের মাথাদের কাছে আবেদন করা হয়, ইহা টিকিয়া থাক, তাহা তাঁহারা চান কিনা। একটু একটু করিয়া চারিধারে গড়িয়া উঠে বিদ্যালয় ও উপাসনালয়। গত বৎসর পৃথিবীর সকল প্রতিনিধি এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বারোজন সদস্যের একটি পরিষদ গঠন করিয়াছেন ; সদস্যদিগকে নির্বাচিত করা হইয়াছে উচ্চতর পদমর্যাদার ভিত্তিতে।—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকাগো, নিউ ইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকোয় তিন-চারটি কেন্দ্র আছে। ইংলণ্ডে কোনো কেন্দ্র নাই। তবু ইংলণ্ড বিবেকানন্দকে সর্বাধিক

ঐকান্তিক বন্ধু ও শিষ্য যোগাইয়াছে। কিন্তু তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবে। মননশক্তির মানদণ্ডে ইংলণ্ড আমেরিকার অপেক্ষা অনেক উচ্চ-স্তরের। তাহার নিকট বাণী পৌঁছাইয়া দিতে প্রয়োজন হইবে দুর্লভ মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেই সঙ্গে সুশিক্ষিত ও ইউরোপের উচ্চ সভ্যতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে সক্ষম এমন সন্ন্যাসীদের। মনে হয়, তাহাদের সংখ্যা অধিক হইবে না।

ওংকারানন্দ সম্পর্কে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের এক বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; তিনি বেলুড়ের তরুণতম সন্ন্যাসীদের অন্যতম এবং সর্বাধিক পণ্ডিত, যেমন ভারতীয়, তেমনি ইউরোপীয় চিন্তায় পারদর্শী। তিনি পরিষদের বারোজন সদস্যের একজন।

সারদানন্দেরও বিরাট কর্তৃত্ব। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বলিলেন, তিনি "জিব্রল্‌টারের মতো শক্তিমান্," বিশাল ও বিরাট এক প্রস্তরময় পর্বত,—পরম প্রশান্ত। সকালে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া উপাসনা করেন। তারপর দিবসের একাংশ অবিচলিতচিত্তে প্রতিটি স্বীকারোক্তি শুনেন, এবং শুধু তাঁহার প্রশান্তিই এক আশীর্বাদের কাজ করে।

পরের দিকে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট অনেক আশা করা হইয়াছে। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড যখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি একজন মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি ( ধনগোপাল ) ডুবিয়া গেলেন বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে জানিবার পর হইতে তিনি ( ধনগোপালের স্ত্রী ) যে উচ্চ স্তরের মানুষ তাহা মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বুঝিয়াছেন। এবং তিনি মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবেকানন্দের আশাকে দেখেন ( সর্বোপরি দেখেন "অদ্বৈতবাদী" প্রবণতাকে ) ;—প্রথম দিকে মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইতে চান নাই। তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রাচীনকালের মহান শঙ্করের অনুগামী। কিন্তু মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহাকে মনে করাইয়া দিয়াছিলেন সেই কথাটি যাহা তিনি বিবেকান্দকে বলিতে শুনিয়াছিলেন। বিবেকানন্দকে যখন অনুযোগ করা হইয়াছিল যে, তিনি কোনো নূতন ভাব আনিতেছেন না, ত্রয়োদশ

শতাব্দীর চিন্তাই পরিবেশন করিতেছেন, তখন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমিই শঙ্কর।" তখনই মুখোপাধ্যায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড স্বীকার করিলেন: বিবেকানন্দ ছিলেন পূর্ণ, তাই তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যেকে লইয়াছে, যাহা যাহার ভালো লাগিয়াছে। আমি লইয়াছি (এবং তাহা বাহিরে ছড়াই) সর্বোপরি শক্তি, কারণ ইহাই আমার মঙ্গল করিয়াছে, আর আমি জানি ইহাই সবচেয়ে মঙ্গলকর। কিন্তু নিবেদিতাকে যখন বলিয়াছিলাম: "তিনি ছিলেন পূর্ণ শক্তি,' তখন নিবেদিতা উত্তর দিয়াছিলেন: 'কিন্তু আমি তো তাহা আদৌ বুঝি নাই।' 'তাহার কারণ তাহা মোটেই আপনার জন্য নয়।'"—কেননা, প্রত্যেকের স্বভাব ও সাধনমার্গ যেমন ছিল, তাহার সঙ্গে তিনিও ছিলেন তেমন।

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তারপর আমার কাছে স্বীকার করিলেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। তখনও তরুণ থাকিলেও, এমন অনেক দিন আসিয়াছিল যখন জীবনের ভারে তিনি আর চাহিতেন না যে, তাঁহার জীবন দীর্ঘ হউক। তাহাকে ভয়ংকর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে কতো ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। তাঁহার বিরুদ্ধে সনাতনীরা ও অসনাতনীরা, ইংরেজরা ও ভারতীয়রা। সে যুগে ভারতবর্ষের ইংরেজরা ভারতীয়দিগকে—এমন কি তাহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকেও অপমানজনক অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, এবং যে ইউরোপীয়রা তাহাদের সহিত মেলামেশা করিত, তাহাদের দুর্নাম হইত, ভগিনী নিবেদিতা সমাজচ্যুতা হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহার নিজের কথা যথাসম্ভব কম বলিলেন, তাছাড়া, তিনি ছিলেন আমেরিকান এবং নির্ভর করিতেন মার্কিন কনসাল-জেনারেল প্যাটারসনের বন্ধুত্বের উপর: প্যাটারসনের স্ত্রী ছিলেন প্রথম দিকের বিবেকানন্দ-পন্থী: (কাছে আসিবার জন্য বিবেকানন্দকে দিয়া ম্যাক্‌কিন্‌লেকে বলাইয়া তাঁহার স্বামীকে ভারতবর্ষের কনসাল-জেনারেল করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়

সমাজের চক্ষে তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে হেয় না করিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে আসিতে বিবেকানন্দ আপত্তি করিয়াছিলেন। ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল এই যে, সেই অহংকারী ও সুন্দরী মার্কিন মহিলাকেই তাঁহার সন্ধানে যাইতে হইত।) অন্য দিকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভারতীয় সনাতনপন্থীদের নিন্দাবাদের অন্ত ছিল না, কারণ তিনি অহিন্দুদের মধ্যে পবিত্র বাণী প্রচার করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত খাইতেন। (অপর পক্ষে অন্যরা বলিত: এইসব মহিলাদের সহিত এক টেবিলে আহারে বসিয়া মাথা খালি রাখার অশ্রদ্ধা দেখানোটার কি আবশ্যক ছিল?) —এখন সব বদলাইয়া গিয়াছে। ৩০ বছরে পুরাপুরি মোড় ফিরিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের ইংরেজ সমাজের রীতি হইয়াছে ভারতবর্ষের বড় বড় লোকদের খুঁজিয়া বাহির করা, এবং বেলুড়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে যাইবার যোগ্য বলিয়া অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা।

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বিবেকানন্দের সহিত কাশ্মীর ভ্রমণের গল্প করিলেন, তাঁহারা ছিলেন চারিটি শিকারায়, তাহাতেই থাকা-খাওয়ার কাজ হইত। একটায় বিবেকানন্দ ছিলেন একা। অন্য একটায় ভগিনী নিবেদিতা। তৃতীয়টাতে শ্রীমতী প্যাটারসন। চতুর্থটিতে মিস্ ম্যাক্‌লেঅড। (সেই শিকারায় খাইবার সময়ে সকলে একত্র হইতেন।) কিছুদিন পরে শ্রান্ত, উদ্বিগ্ন বিবেকানন্দ একাকী নিজের শিকারায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৫টা দিন নির্জনে নিঃসঙ্গ ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়াছিলেন প্রশান্তি লইয়া। তিনি বলিয়াছিলেন, "মা (ভারতীয়দের চিরকাল পছন্দ ঈশ্বরকে মা বলা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'জগৎটা তোর, না আমার? আমি তোকে বাঁচাই, না তুই আমাকে বাঁচাস?' তখন তাঁহার উদ্বেগ কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি নিজেকে মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন ('তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!' 'Fiat voluntas tua!')"

একবার হিমালয়ে বিবেকানন্দ ও মিস্ ম্যাক্‌লেঅড এক ব্রাহ্মণের

সহিত যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণটি যাইতেছিলেন আগে আগে। তাঁহার কপালে ছিল রঙ দিয়া রেখা টানা, তাহাতে তাঁহাকে কিম্ভূত দেখাইতেছিল। কিন্তু তাহা দেখাইলেও তাঁহার অন্য সব কিছু ছিল সুন্দর ও মহিমাব্যঞ্জক। মিস্ ম্যাকলেঅড কোনো কিছুর সমালোচনা করিবেন না বলিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের কাছে একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য না করিয়া পারিলেন না। বিবেকানন্দ সিংহের মতো ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে যেন দৃষ্টি দিয়া ভস্ম করিতে চাহিলেন, "থামুন! আপনি নিজে কতটুকু করিয়াছেন?" মিস্ ম্যাক্‌লেঅড অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। পরে তিনি জানিয়াছিলেন, এই ব্রাহ্মণটি অতি দরিদ্র, স্ত্রীপুত্র আছে—ইনি তাঁহাদেরই একজন যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থে বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্য জগতে দৌত্যের কাজে পাঠানো সম্ভব হইয়াছিল।—এবং মিস্ ম্যাকলেঅড বুঝিয়াছিলেন, মানুষ যে কাজ করে, তাহা দিয়াই তাহাকে বিচার করিতে হয়।

এক সময় এক ভারতীয় সাধু ছিলেন, তিনি ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা হইত। তাঁহার নাম পাউরী ( পাহাড়ী ) বাবা। তিনি সকল কিছু পরিহার করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত তিনি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তরুণ বিবেকানন্দ যখন উতলা হইয়া সর্বত্র ঈশ্বরকে সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন,—তখনও যখন রামকৃষ্ণ ও পাউরী বাবার মধ্যে দুলিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং কয়েক সপ্তাহ তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ছিলেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের কাহিনী অনুসারে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও পাউরী বাবা একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু বিবেকানন্দ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেনঃ "সাধ্য ও সাধন এক হইতে হইবে।"—এই পাউরী বাবা জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন গায়ে কেরোসিন ঢালিয়া নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া।

থিওজফি ও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসীদের নাম শুনিলে বিবেকানন্দ আঁতকাইয়া উঠিতেন। তিনি বলিতেনঃ "যে টাকার পিছনে ছোটে, সে ইতর। কিন্তু গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ ও প্রেততত্ত্বের পিছন যে ছোটে, সে দ্বিগুণ ইতর। উহাকে কড়ে আঙ্গুল দিয়াও ছুঁইতে নাই! উহা নোংরা করে!"

সৎ ও বুদ্ধিমান উইলিয়ম স্টীডকে এই নির্বুদ্ধিতায় পাইয়া বসিতে দেখিয়া তিনি বেদনা বোধ করিতেন, অন্য সব বিষয়ে মানুষটি বুদ্ধিবিচারে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বুদ্ধিবিচার হারাইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ তাঁহার মহান্ শিষ্যের নাম দিয়াছিলেন বিবেকানন্দ। ইহা অকারণ ছিল না (বিবেক—বিচারের ক্ষমতা)। (প্রতিটি সন্ন্যাসীর নামের সঙ্গে যুক্ত 'আনন্দ' শব্দটির অর্থ সুখ)।

ভারতবর্ষের বড় বড় সাধুদের ভাবাবেশ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা যখন বলা হয়, ইহা কখনও ভুলিলে চলিবে না, ইহাদের ও ইউরোপের নিকৃষ্ট অধিবিদ্যার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নাই। লক্ষণীয় যে, ঐ অধিবিদ্যা মিথ্যা হইবে বলিয়া তাঁহারা তাহাকে ততোটা অবজ্ঞা করেন না (তাঁহারা সে কথা মোটেই বিচার করেন না), যতোটা করেন তাহা নিকৃষ্ট ও অকেজো বলিয়া। (তাঁহাদের নিকট 'অকেজো' হইতেছে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ,—সম্ভবত, ইহা যাহা ঘটাইতে পারে। ইহা তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছেন ফকিরদের—দিব্য ব্যাপারের বুজরুকদের হাতে।)

তাঁহাদের দিব্য-বিজ্ঞান সত্যই এক উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান, মনের এক দীর্ঘ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে লব্ধ। ইহা কতোই না বাঞ্ছিত হইত,—বিশ্লেষণ করিবার জন্য, সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিবার জন্য হইলেও —যদি ইউরোপীয়রা পশ্চিমের নিয়ম অনুসারে শ্রদ্ধার সহিত উহা লইয়া পড়াশুনা করিতেন। উহার সামান্য যেটুকু চোখে পড়িয়াছে, তাহাই আমাকে দিতেছে চিন্তার শক্তি,—এবং বিশেষ করিয়া, মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের বিপুল এক সম্পদকে!…

রামকৃষ্ণ যখন কোনো পুরুষ বা নারীকে যাচাই করিতে চাইতেন, তখন তাঁহার চোখের সামনে তাঁহাকে উলঙ্গ করিতেন। যখন জানিতে পারিতেন, কোনো শিষ্য বিবাহ করিতে চায়, এই ভাবেই তিনি আচরণ করিতেন। তিনি কন্যাকে আনাইতেন এবং নিরাবরণা করিয়া মুহূর্তের জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তারপর বলিতেন: "ও তোর জুটি হবে।" নয়তো বলিতেন: "ঈশ্বরের পথে ও তোর সঙ্গে চলতে পারবে না।"—যখন কোনো তরুণ তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিত, তখন বলিতেন: "দেখি তোর বুকটা।" এবং দেখিয়া শুনিয়া বলিতেন: "বেশ বড়ো! হ্যাঁ, তুই পৌঁছতে পারবি।" যখন রবীন্দ্রনাথের বাবাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখনও সেই অসামান্য ও সম্মানীয় ব্যক্তিটিকে ঐ একই কথাই বলিয়াছিলেন: "দেখি তোমার বুক।" তাঁহার বুক দেখিয়াছিলেন। বুকটা খুব লাল। তিনি বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বর তোমাকে ভালো করেই দেখা দিয়েছেন।"

তাহার কারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালনের ধারা প্রশ্নটি ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের নিকট এক মৌল প্রশ্ন। শ্বাসবায়ু এবং রক্তের ক্রমান্বয়ী (এবং বিপজ্জনক) যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে একমাত্র তাঁহারাই ঈশ্বর-দর্শনে উপনীত হইতে পারেন। তাঁহাদের তত্ত্ব অনুসারে পাঁচটি আভ্যন্তর পদ্ম, পাঁচটি স্নায়ুকেন্দ্র, পাঁচটি রক্ত-কপাট আছে,—সেগুলি দেহের ভিত্তিমূল ও যৌনাঙ্গ হইতে চলিয়া গিয়াছে হৃদয়ে, কণ্ঠে, অবশেষে মূর্ধায়, যখন সেগুলি 'সর্বশেষ কপাটে পৌঁছায়, তখন বুকের ত্বক্ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে (এবং প্রায়ই পরে এই দাহের দাগ থাকিয়া যায়), চোখে রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়, (অথবা তাঁহাদের ভাষায় 'পিঁপড়ের কামড় লাগে') ।—কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো মানুষ ইহার বিপদ ভালো করিয়াই জানিতেন; তিনি শিষ্যদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। সর্বশেষ সমাধির চেষ্টায় অনেকে মারা গিয়াছেন, অথবা পাগল হইয়া গিয়াছেন।—রামকৃষ্ণের মতো মানুষ—যাঁহার ভাবাবেশ ছিল নিত্যদশা—ব্যতিক্রম হইয়া আছেন। এমন কি বিবেকানন্দও ইহা কদাচিৎ লাভ

করিয়াছেন—জীবনে দুইবার কি তিনবার, তিনি আর ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেন না।

গান গাহিয়া বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ যে ধর্মীয় নৃত্য করিতেন, মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাহা দেখিয়াছেন। সেই সম্পর্কে তিনি বলিলেন যে, 'নৃত্য' বলিতে আমরা ইউরোপে যাহা বুঝি, তাহার সহিত ইহার সামান্যতম সাদৃশ্যও নাই। বিবেকানন্দ খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেন, লম্বা জোব্বা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত, পায়ে থাকিত মল, নড়িতেন কি নড়িতেন না, বিনা ভঙ্গিতে দুই হাত নাড়াইতেন, শুধু চোখে পড়িত দেহটি, গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে ঝুঁকিতেছেন, আর পায়ের মল কাঁপিতেছে।—কিন্তু ধর্মীয় লোকোৎসবে তীর্থযাত্রীদের যে বিরাট বিরাট পবিত্র নৃত্য-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেখানে তাহারা প্রায়ই শ্রান্ত ও নিঃশেষিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ইহা তাহাদের মাদকতার ক্রিয়া—তাহাদের একমাত্র মাদকতা। আর এই মাদকতা নির্দোষ।

ফ্রান্স সফর সম্পর্কে বলিতে গিয়া নিদারুণ বিরক্তিভরে মিস্ ম্যাক্‌লেঅড জ্যুল বোআর নীচতার কথা বলিলেন: বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তিনি কৌশল করিয়া এমা কাল্‌ভেকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি মর্যাদাশীলা এমা কাল্‌ভে এই বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিয়াছিলেন যে, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, তাঁহার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আছে।—পের ইয়াসঁ্যাতের সংসার বিবেকানন্দের স্মৃতিতে এক বেদনাদায়ক ছাপ রাখিয়াছিল। মনে হয়, তাঁহার (মার্কিন) স্ত্রীটি ছিলেন (তাঁহার চিঠি হইতে যেমন মনে হইয়াছে) অসহ্য। যদি বিবেকানন্দের প্রয়োজন থাকিত, তবে এই মহিলাই তাঁহাকে চিরকৌমার্যে অনুপ্রাণিত করিতেন। এবং 'বেচারা পের ইয়াসঁ্যাতের' জন্য তাঁহার সহানুভূতি ছিল। পের ইয়াসঁ্যাতকেও সর্বদা মনে হইত লজ্জিত, বিধ্বস্ত ও উৎকণ্ঠিত; তিনি যে ভালো করিয়াছেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন। সমর্থন চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইতেন. বলিতেন, "তাই না?

আমার ছেলে যদি উচ্চমনা হয়, তাহা তো আমার কাজের উপযুক্ততারই পরিচয় হইবে। তাই না? দেখিতে পাইতেছেন না?"—(যে ঈশ্বরকে তিনি ডাকিতেন, তাঁহার উপরেই ইহার উত্তর দেওয়ার ভার ছিল।)

রামকৃষ্ণের বিখ্যাত কথামৃতে যিনি 'ম' স্বাক্ষর করিতেন, তাঁহার সম্পর্কেও প্রশ্ন। তাঁহার নাম মহেন্দ্র গুপ্ত। কলিকাতার একটি বড় স্কুল চালান। তিনি সংসারী। পিতামাতার মনে আঘাত দিয়া অনেক ছোট ছোট ছাত্রকে তিনি রামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন।

ওকাকুরা বিবেকানন্দকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, এবং জাপান সফরের সময়ে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডই সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া বিবেকানন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেখা হইবার পর-দিনই তিনি মিস্ ম্যাক্‌লেঅডকে বলিয়াছিলেন: "উনি আপনার জিনিস নন। উনি আমাদের।"—এবং অত্যন্ত অভিভূত হইয়া আরও বলিয়াছিলেন: "আমরা দুই ভাই। বিপরীততম দূরত্ব হইতে আসিয়া মিলিয়াছি।"—কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহারা নিজ নিজ কাজে পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মের মহিমা পুরোপুরি বুঝিলেও তাহার জন্য ওকাকুরা নিজেকে প্রস্তুত বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার ছিল নিজের সাম্রাজ্য—শিল্পকলার সাম্রাজ্য।—মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহার স্টুডিয়োতে বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, শিল্পীরা তাঁহাদের শিল্পকর্ম তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তা দূরে রাখিয়া শিল্পীর দৃষ্টিকোণ ও চিন্তার মধ্যে নিজেকে স্থাপন করিয়া সেগুলির বিচার করিতে, এমন কি সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কবিতা লিখিতেন; আর যে কবিতা লিখিতেন, পরদিন সকাল হইতে তার পরদিন পর্যন্ত ঘরের দেওয়ালের কাঠের গা তাহা দিয়া ঢাকা থাকিত।

প্রথম দিকে ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের নিকট হইতে কঠোর ব্যবহার পাইতেন। সমস্ত প্রকারে বিবেকানন্দ তাঁহার গর্বিত ও যুক্তিবাদী ইংরেজ চরিত্রটিকে নত করিতেন। নিবেদিতা তাঁহার প্রতি যে উপাসিকার অনুরাগ দেখাইতেন, সম্ভবত তাহা হইতেও তিনি নিজেকে বাঁচাইতে চাহিতেন। (কেননা মনে হয়, তাঁহার সম্পর্কে নিবেদিতার ছিল প্রেমিকের উপাসনা, আমাদের বান্ধবী মিস্ স্লেড যাহা দেখাইতেছেন গান্ধীর সম্পর্কে। কিন্তু গান্ধীজী ও মিস্ স্লেডের মধ্যে ৩০ বছরের ব্যবধান, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে ছিল মাত্র ৫ হইতে ৬ বছরের। এবং নিবেদিতার মনোভাব চিরকাল নির্মল হইলেও, সম্ভবত বিবেকানন্দ ইহার মধ্যে বিপদের গন্ধ পাইতেন।) কোনো দিকে না তাকাইয়া তিনি নিবেদিতাকে ভর্ৎসনা করিতেন, নিবেদিতা যাহা করিতেন তাহাতেই ত্রুটি ধরিতেন। ভাঙিয়া পড়িয়া, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে নিবেদিতা মিস্ ম্যাক্লেঅডের বুকে মুখ লুকাইতেন। —অবশেষে এ সম্পর্কে বিবেকানন্দকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হইত। তাহাতে তিনি অবাক হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন: "ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন; এবং তারপর হইতে তিনি তাঁহার ব্যবহার একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, নিবেদিতার সহিত অনেক মধুর ব্যবহার করিতেন।—কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে যে অনুরাগ দেখানো হইত, তাহাকে আমল দেওয়ার বা গান্ধীর মতো বাৎসল্যের দাক্ষিণ্যে তাহাকে দেখিবার মতো মানুষ তিনি মোটেই ছিলেন না। তাঁহার স্বভাবে ছিল প্রচণ্ডতা; আর ইহ ও আরও ভাবিবার বিষয় যে, তিনি বয়সের আগেই মারা গিয়াছিলেন।—তিনি ক্রোধের ভয়ংকর কবলে পড়িতেন, তখন কিছুই রাখিয়া-ঢাকিয়া করিতেন না। মিস্ ম্যাক্লেঅডের মনে পড়ে না, তারপর তিনি কখনও ক্ষমা চাহিয়াছেন। কিন্তু আরও মধুর ব্যবহারে তিনি তাহা শুধরাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। —স্কুল-মাস্টারি পেশা হইতে নিবেদিতার মধ্যে ঈষৎ শিক্ষিকাসুলভ মনোভাব থাকিয়া গিয়াছিল; তাহার ফলে যাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন,

তাঁহার ত্রুটিগুলি ধরাইয়া দিতেন এবং নিজের যুক্তিকে সপ্রমাণ করিতেন। তাঁহার এই ব্যাপারটি অনেকেই ক্ষমা করেন নাই। (অনেকের মধ্যে আছেন মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের আত্মীয়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী, লর্ড স্যাণ্ডউইচ।)

(যদিও বিবেকানন্দ তাঁহার বুদ্ধি ও তাঁহার পরিপূর্ণ ভক্তির মূল্য বুঝিতেন,—যদিও তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গতা উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন, তবুও তিনি মূলত পছন্দ করিতেন ভগিনী ক্রিস্টিনকে। ভগিনী ক্রিস্টিন ছিলেন তাঁহার অনেক কাছাকাছি। বহু বৎসর পরিবারের ভার বহন করিয়া তিনি জীবনের অনেকখানি কাটাইয়াছেন, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। বিবেকানন্দ তাঁহার আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই যে, তিনি আসিয়াছিলেন বিবেকানন্দের মৃত্যু দেখিতে,—মৃত্যুর তিন মাস আগে। (মৃত্যুর দিন নিবেদিতা আদৌ উপস্থিত ছিলেন না; তিনি আসিয়াছিলেন পরদিন।)—তারপর হইতে ভগিনী ক্রিস্টিন,—আগেই যেমন বলিয়াছি—হিমালয়ের আশ্রমে (যেখানে বিবেকানন্দ মরিতে চাহিয়াছিলেন) নির্জনবাসী হইয়াছিলেন; তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন অদ্বৈতবাদে (মনে হয়, অদ্বৈতবাদ ছিল বিবেকানন্দের চিন্তার ভিত্তি)।—ভগিনী নিবেদিতাকে মননশীল দেখাইলেও, ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচর রূপগুলি তাঁহার মন হইতে কম নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের হাই চার্চগোষ্ঠীর মানুষ, এই গোষ্ঠী সাধু-সন্তদের পূজা করে। এবং পরে তিনি অনায়াসে সমস্ত ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড অবাক হইয়াছিলেন, প্রতিদিন দেবতা ও মৃতদের উদ্দেশে এইসব নিবেদন-কর্মে নিবেদিতার কখনও ত্রুটি হয় নাই।

কারণ, এই কঠোর ধর্মীয় রীতি প্রচলিত আছে যে, দেবতাদের অংশ নিবেদন না করিয়া, এবং দিব্য পুরুষদের মৃত্যুতিথিতে তাঁহাদের আসন পাশে না রাখিয়া ও তাঁহাদের উদ্দেশে অন্ন পরিবেশন না করিয়া আহার করা চলিবে না। বিবেকানন্দের মৃত্যু-তিথিতেও তিনি যাহা

যাহা খাইতে ভালোবাসিতেন, সেগুলি সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করা হয়। (মিস্ ম্যাক্লেঅড লজ্জিত ও অপরাধীর মতো মুখভঙ্গি করিয়া প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—এমন কি চকোলেট আইসক্রীম পর্যন্ত!)—তিনি খোলাখুলিভাবে সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আপনারা কি ভাবেন, ইহা স্বামীজীকে তৃপ্তি দিবে?"—"না।"—"তাহা হইলে আপনাদের জন্য?"—"হ্যাঁ, ইহা আমাদিগকে তৃপ্তি দেয়।"

বিবেকানন্দ নিজে এই কৃত্য অনুমোদন করিতেন। মানুষের দুর্বলতার জন্য তিনি ইহাকে মানিয়া লইয়াছিলেন। এইসব নিয়মমাফিক ও বারংবার কৃত আঙ্গিকগুলি ছাড়া ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলিকে স্মরণ করিতে ও অক্ষুণ্ন রাখিতে মানুষ অক্ষম। তিনি বলিতেন: "ইহা বাদ দিলে, উহাদের কাছে ইহা হইবে কেবল বুদ্ধির ও সূক্ষ্ম চিন্তার ব্যাপার (আর তিনি কপালে হাত ঠেকাইতেন)। ভারতীয় সন্ন্যাস-জীবন ও ক্যাথলিক সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যকার অতি-আত্মীয়তা আরও একবার এইখানে কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছায়।

রাত নামিলে সন্ধ্যারতি। শঙ্খের ধ্বনিতে তাহার ঘোষণা সেই কৃষ্ণের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অসংখ্য ঘণ্টার শব্দ। রামকৃষ্ণের প্রাত্যহিক আরতির সময়ে টিং টিং শব্দে নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টা বাজে, আর পূজারীর এক নিষ্কম্প হস্ত প্রদীপ তোলে আকাশের দিকে, কিংবা গঙ্গাজল ছিটায়, কিংবা রাজমর্যাদার প্রতীক চামর দোলায়।

রামকৃষ্ণ হাতের কাজে ছিলেন শিল্পী। তিনি দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি গড়িতেন। প্রত্যেককেই তাহা গড়িতে হয়—খড়ের উপর মাটি দিয়া—কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষে এবং পরে তাহা গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

সাজানো-গোছানো ও পারিপাট্যের এক চমৎকার বোধ ছিল

রামকৃষ্ণের—তাহা বিবেকানন্দের মোটেই ছিল না। জানা যায়, রামকৃষ্ণ তাঁহার বালিকা-পত্নীকে প্রতিটি গৃহস্থালির কাজ শিখাইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন (নরেন্দ্রনাথ দত্ত); কিন্তু রীতি অনুসারে তাঁহাকে ডাকা হইত স্বামীজী বলিয়া।—ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি মিস্ ম্যাক্‌লেঅডকে নাম দিয়াছিলেন: "জো" (জোসেফিন)।

নিজের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ আচার সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন; ইউরোপীয়দের মতো বন্ধু-বান্ধবের ভোজে যাইতেন, অন্য সকলের মতোই খাইতেন (এমন কি মাংসও), এবং খাইতে খাইতে গল্প করিতেন—যাহা ভারতীয়রা কখনও করে না,—করিতে জানেও না।

মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের স্মৃতি অনুসারে তাঁহার রঙ ছিল রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা কম ফর্সা, তবে কালো নয়।—তিনি তাঁহার (বিবেকানন্দের) একটা ফটো দেখাইলেন—মোটাসোটা হাসিখুশি এক কিশোর।

১৮ই মে।

মিস্ ম্যাক্‌লেঅড ফিরিয়া গেলেন। তিনি গেলেন মঁপেইয়েডে প্যাট্রিক গেডেস এবং ব্রতায়ঁতে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে খুঁজিয়া বাহির করিতে।

ভদ্রমহিলা সৎ, সরল ও নির্ভেজাল। তাঁহার বিচার-বিবেচনায় তিনি অগভীর হইলেও, তিনি বিচার করেন আন্তরিকতার সহিত। তিনি যাহা ভাবেন, তাহার অধিক নিজেকে ভাবাতে বা ভাবিতে চেষ্টা করেন না। তিনি স্বাধীন এবং অন্যদের—এমনকি যাঁহাদিগকে ভালোবাসেন তাঁহাদের—স্বাধীনতাকে সম্মান দিতে জানেন। বিবেকানন্দকে তিনি খুব

ভালোবাসিয়াছিলেন। এই স্মৃতি তাঁহাকে যে আনন্দ দিয়াছে, তাহাতেই তিনি বাঁচিয়া আছেন। নিঃস্বার্থ এই ভালোবাসা, এই স্মৃতি, এই আনন্দ। নিজের পথে তিনি যে আলোর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা ধরিয়া রাখিতে এবং তাহাকে ছড়াইয়া দিতে তিনি ভালোবাসেন। তিনি সেই পতঙ্গদের মতো যাহারা মধু খাইয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে নবজন্মের পরাগ বহিয়া লইয়া যায়।

ফ্রান্সে এমা কাল্‌ভের সহিত মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের সদ্য সাক্ষাৎ হইয়াছে; এমা কাল্‌ভের স্মৃতির সহিত তাঁহার নিজের স্মৃতি মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল। আমাদের জিজ্ঞাসার সূত্র ধরিয়া তিনি এমা কাল্‌ভেকে তলস্তয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের এক অতিপরিচ্ছন্ন স্মৃতি এমা কাল্‌ভে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন: তিনি বলিয়াছেন, কন্‌স্ট্যান্টি-নোপলে তিনি বিবেকানন্দকে 'রেসারেক্‌সনের' কথা পের ইয়াসঁ্যাতের কাছে শ্রদ্ধার সহিত বলিতে শুনিয়াছিলেন। পের ইয়াসঁ্যাত দ্বিধার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্মে ভিত্তিমূলক কিছুই নাই।" —বিবেকানন্দ এক মুহূর্ত পের ইয়াসঁ্যাতের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। তারপর মিষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমাদের কারোর ধর্মেই কি কোনো ভিত্তি আছে?"—এবং কাল্‌ভে আরও বলিয়াছেন: "পের ইয়াসঁ্যাতের কথা বলিতে গিয়া স্বামীজীর মুখে-চোখে সব সময় কী যে বেদনার, কী করুণার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত এবং গর্ব ও দম্ভের জন্য যে হতভাগিনী স্ত্রী তাঁহাকে ব্রতভ্রষ্ট করাইয়াছিল, তাঁহার প্রতি যে তাঁহার কী গোপন অবজ্ঞা ছিল,—তাহা ভুলিতে পারা যায় না।"

—আমি মিস্ ম্যাকলেঅডকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বিবেকানন্দের কণ্ঠের প্রকৃতি ঠিক কেমন ছিল। সঙ্গীতে জ্ঞান সামান্য হওয়ায় তিনি আমাকে তাহা বলিতে পারেন নাই; "প্রাণবন্ত, মর্মস্পর্শী,—যতো কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি সকলের চেয়ে সুন্দর"—এইরকম বর্ণনাতেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন।—এ বিচারের ভার সম্পূর্ণ কাল্‌ভের; তিনি বলিয়াছেন,

তাহা ছিল "এক পুরুষসুলভ উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তাহার স্বচ্ছন্দ উত্থান-পতন ছিল চীনা ঝাঁঝের মতো।"

জুন, ১৯২৭।

—মায়াবতীর ( ভায়া চুম্পাবৎ, জেলা আলমোড়া ) 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ( হিমালয়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সুমহৎ পত্রিকা ) সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ ৩০শে মে আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। রামকৃষ্ণের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমি যে আগ্রহ দেখাইতেছি, তাহা তিনি জানেন এবং তিনি আমার ব্যক্তিগত মতামত চাহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম ( ২৬শে জুন ):

"এক বৎসর হইল, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের কয়েকটি পাতা রামকৃষ্ণের মহান্ হৃদয়টিকে বাস্তবিক পক্ষে আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে; এবং এই আলোক-রেখা আমাকে তাঁহার জীবন ও চিন্তাকে জানিবার জন্য উদ্দীপিত করিয়াছে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত যে বইগুলি ভারতীয় বন্ধুরা প্রীতিভরে আমাকে পাঠাইয়াছেন, কয়েক মাস ধরিয়া আমি ও আমার ভগিনী সেগুলি পড়িয়াছি। গত মাসে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এবং দিনের পর দিন আমরা একত্র স্বামী বিবেকানন্দের কথা একটানা আলোচনা করিয়াছি।—স্বামী বিবেকানন্দ আমার চোখে যেন আত্মিক শক্তির এক জ্বলন্ত উৎস,—এবং রামকৃষ্ণ-প্রেমের এক প্রবাহিণী। তাঁহারা দুইজনে ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন বিকিরণ করিয়াছেন। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রতিভার ঊর্ধ্বে।—আমি তাঁহাদের উদ্দেশে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করিতে চাই, যে গ্রন্থ পাশ্চাত্যের বহুজনের নিকট তাঁহাদিগকে পরিচিত করিবে। কাজটা দীর্ঘ ও সুকঠিন। তাঁহাদের সমৃদ্ধ চিন্তায় বহুবিধ উপাদান ভীড় করিয়াছে। পাশ্চাত্যের বুদ্ধি ( ও এমন কি হৃদয় ) যে শৃঙ্খলা-বোধের দাবি করে, তাহা হইতে এই চিন্তার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে

বলিয়া আমার মনে হয় না। এই উপাদানগুলির একাংশ বিশেষভাবে ভারতীয়। অন্য অংশ বিশ্বজনীন। এবং শেষেরটিকেই আমাকে পৃথক করিতে হইবে।—ইউরোপীয় মস্তিষ্কে কিছু কিছু কথার যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হইবে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে ফলাফল উদ্ভূত হইতে পারে, সেগুলির কথা আমাকে সর্বদা ভাবিতে হইবে। কারণ, ইউরোপীয়দের নিকট সবটাই ক্রিয়া বা সবটাকেই ক্রিয়া হইতে হইবে।—এখানে একটা বিপদ আছে; শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা বিশেষরূপে ছাঁচ অনুযায়ী গড়িবার উপযোগী ( plastique ) এবং যাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, প্রায়ই তাহাদের বিভিন্ন হৃদয়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয় ( রামকৃষ্ণ করেন প্রেমের সহজাত বৃত্তির ( instinct ) বলে,—যে সহজাত বৃত্তি যাহা কিছু দেখে তাহাতেই নিজেকে পরিবর্তিত করে; আর বিবেকানন্দ করেন আবেগদীপ্ত প্রতিক্রিয়ার বলে,—যে প্রতিক্রিয়া মনকে কাদামাটির মতো গড়িয়া তুলিতে ও আকার দিতে চায় ); এই চিন্তা নিজেকে প্রকাশ করে অতি বেশি বহু অর্থে, এবং সময়ে সময়ে সেগুলিকে মনে হয় ( কার্যতঃ ) পরস্পরবিরোধী।—এখন, ইউরোপে ও সারা পৃথিবীতে আমরা রহিয়াছি কর্মের এক ঝড় হইতে বাহির হইয়া আসা এক সামাজিক ঝড়ের মুহূর্তে এবং আগের চেয়েও প্রচণ্ডতর কর্মের এক নূতন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বমুহূর্তে,—যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথের নির্দেশ চাহিতেছে। যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ও সহজ নির্দেশ তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং সেজন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না; কারণ ঘূর্ণিঝড় আদৌ অপেক্ষা করিবে না।—যে-পথ ধরিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে, যে আলোক-রশ্মি সেই পথ আলোকিত করিতেছে—সেই আলোকরশ্মিকে সূর্য হইতে পরিস্রুত হইতে দেওয়া সেইজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন।—আমরা আজ যে সময়ের মধ্য দিয়া চলিতেছি,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—বিবেকানন্দ যদি ইহার মধ্য দিয়া চলিতেন, তিনিও ইহা প্রবলভাবে অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে—এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণের মৃত্যুকালে—জগতের মহাঝড়

মানুষকে তাহার ঘূর্ণিপাকে টান দেয় নাই, তখনও ছিল নিশীথ রাত্রি, তখন নিঃশব্দে ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছিল। এখন যাহারা মরিতে চলিয়াছে ( আমি আত্মার মৃত্যুর কথা বলিতেছি ), তাহাদের সকলের কথা ভাবিতে হইবে, ভাবিতে হইবে তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া হইবে কিনা।—আমার ও আমার ভগিনীর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যে ভগিনী ক্রিস্টিনের সহিত পরিচিত হই; তাঁহার সম্পর্কে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত কথা বলিতে শুনি। আমার বিশ্বাস, খুব কম মনই তাঁহার মতো বিবেকানন্দের মনের এতো কাছাকাছি হইবার সুযোগ পাইয়াছে। চিঠির মাধ্যমে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব, —এই আশা রাখিব যে, একদিন হয়তো তাঁহার সাক্ষাৎ কপালে জুটিয়া যাইবে।—আমাদিগকে আরও বলা হইয়াছে, হিমালয়ের অদ্বৈতাশ্রমে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র এবং বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত বশী সেন নামে এক পণ্ডিত আছেন। আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাই। আমি কেমন যেন তাঁহার চিন্তা অনুমান করিতে পারি ( এবং আমার চিন্তা কেমন যেন আমাকে বলে ), বিজ্ঞান ঈশ্বরের অন্যতম পথ এবং ইহারই মাধ্যমে পাশ্চাত্য ঠিকভাবে ঈশ্বরের অভিমুখে আরও নিশ্চয়তা লইয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে, যদি তাহা ভালোভাবে পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে যদি বিবেকানন্দের নিজের কথা বলিবার সুযোগ হইয়া থাকে, তাহা জানা কাজের হইবে।— প্রিয় স্বামী অশোকানন্দ, আপনাকে ও আপনার ভ্রাতৃবর্গকে আমি প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি। আমি নিজেকে আপনাদের সহিত এক মনে করি সেই জ্বলন্ত স্পর্শের মধ্যে, রামকৃষ্ণ ছিলেন মানুষের রূপে যাহার পরম সঙ্গীত—আপনাদের সকলের উদ্দেশে প্রীতি।”

৯ই জুলাই, ১৯২৭।

—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আসিয়াছেন। জেনেভা হইতে ( সেখানে বুদ্ধিজীবী-সহযোগিতার আন্তর্জাতিক কমিটির সম্মেলনে তিনি অংশ-

গ্রহণ করিয়াছেন ) আসিয়াছেন ভিলা অলগায় মধ্যাহ্ন ভোজনে এবং অপরাহ্ণ যাপনে। তাঁহার সঙ্গে আছেন লেডী বসু, পরনে ভারতীয় পোশাক, তাঁহার মধ্যে তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা জাতিগত লক্ষণ অনেক স্পষ্ট। আমরা তাঁহাদিগকে আনিতে মঁত্র স্টেশনে গাড়ি লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি ফরাসী বলিতে পারেন না, তাই আমার ভগিনী আরও একবার আমাদের দোভাষী হইলেন।

তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া এই মানুষটি নিরবচ্ছিন্নভাবে যে প্রাণশক্তি, যে বুদ্ধিমত্তা ও যে উত্তাপ বিকীর্ণ করিলেন, তাহার একটা ধারণা কী-ভাবে দিই! মানুষটি ছোটখাটো, বুদ্ধিদৃপ্ত দুই চক্ষু, কালো ভ্রূ, রূপালি চুল, একটু সোমাটিক রক্তমেশা ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের লোকের মতো রোদে-পোড়া গায়ের রঙ, ছোট ছোট দুইটি শুষ্ক হাতের ( প্রতিভাবানের হাত ) নখ ছোট করিয়া ছাঁটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য ( আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্চতর স্তরের ) তারুণ্য, এবং কথা বলার, চিন্তা করার, বাঁচিয়া থাকার এক আনন্দ—আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাঁর গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরবর্তী ( ১৯১৫ ) আইনস্টাইনকে।

তাঁহার বিচিত্র বিষয়ের আলোচনার হিসাব রাখা কঠিন, তবুও সেগুলি তাঁহার প্রায় নূতন জগৎকে ঘিরিয়াই আবর্তিত হয়, এই নূতন জগতের তিনি আবিষ্কর্তা,—যেমন আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, তিনি হইতেছেন মনোজীবন, উদ্ভিদ্ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার জগতের আবিষ্কর্তা : মনের নূতন মহাদেশের খ্রীস্টফার কলম্বাস। ত্রিশ বৎসর হইল হঠাৎ তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এক কাঠবাদাম গাছের শরীরে। অসুস্থ অবস্থায় যে ঘরে তিনি শুইয়া থাকিতেন, সেই ঘরের জানালার সামনে এই গাছের ডালগুলি দুলিত। তারপর হইতে—শুধু তাহাকে পর্যবেক্ষণ করাতেই নয়, তাঁহার নিপুণ মাথা-খাটাইয়া-আবিষ্কার-করা অসংখ্য যন্ত্রের সাহায্যে, রেকর্ড-করা গ্রাফের মাধ্যমে তাহাকে দিয়া কথা বলাইতে, তাহাকে দিয়া কথা বলাইয়া লইতেও তিনি আর থামেন নাই। এইখানেই তাঁহার প্রতিভার সবচেয়ে অসাধারণত্ব। কিন্তু ইহার ধারণার

জন্য প্রথমে প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহা খুঁজিতে যাইতেছেন তাহার আধাধর্মীয় স্বতঃলব্ধ বোধটিকে ( intuition ) লাভ করা। এবং এই ধারণা যাহাতে একটা উপলব্ধি দিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল মনের মতোই নিপুণ হাতের অধিকারী হওয়া। তিনি বলিলেন যে, এই কাজের জন্য আঙুলগুলি হইতে চরম স্পষ্টতা ও পরিপূর্ণ নিশ্চলতা লাভ করিতে তাঁহার অন্যূন বছর বারো লাগে ; কারণ তিনি যে যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করেন, সেগুলি এক কোটি হইতে দশ কোটি গুণ বড় করিয়া দেখায় বলিয়া সূক্ষ্মতম কম্পনও স্কেলে ধরা পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া, এই যন্ত্র তৈয়ারির জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে যান না, যান অত্যন্ত সরল সাধারণ মানুষের কাছে ; তিনি যাহা লাভ করিবার কাজে—উদ্ভিদের গভীরে তাহাদের মনের ( যে-মনকে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন ) অদৃশ্য গতিবিধি পড়িতে সফল হইতে চান, তাহা তিনি তাহাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাইয়া দেন :—তাঁহার সর্বশেষ আবিষ্কারগুলি উদ্ভিদের উপরে ও মানুষের উপরে ভেষজ-পদার্থের অনুরূপ ফলাফলের সহিত জড়িত। ইহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অজ্ঞাত এক অঞ্চল উদ্ঘাটিত করিয়াছে ; কারণ, মানুষের উপর একই ফলাফল নির্ণয় করিবার আগে তিনি ঐসব পদার্থকে উদ্ভিদের মনের উপরে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

তিনি উদ্ভিদের ( প্রায় সুনিশ্চিত ) বধিরতার কথা বলিলেন, এবং তাহা পুষাইয়া লইবার জন্য আলোর সমস্ত ঘাটে ( যেগুলির মাত্র একটি অষ্টকই আমরা উপলব্ধি করি )—প্রতিটি বৈদ্যুতিক ও সৌর স্পন্দনে—তাহাদের বিস্ময়কর সংবেদনশীলতার কথা বলিলেন। কীট-পতঙ্গের বধিরতা সম্পর্কে ফরেলের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িল। জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের বলিলেন সাপেরাও বধির। বাঁশি বাজাইয়া সাপুড়েদের খেলা-দেখানো একটা ধাপ্পা ; আসলে তাহার কারণ হইতেছে, বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে সাপুড়েরা হাতের ও বুকের কিছু কিছু ভঙ্গি করিয়া সাপের দিকে ঝোঁকে, সাপ ওই প্রতিবিম্বগুলিতেই

বশীভূত থাকে। লোকদৃষ্টিতে ধরা-পড়া প্রতিটি দৃষ্টিগোচর ব্যাপারকে খুব নিকট হইতে পুনরায় দেখিবার প্রয়োজন আছে, কারণ ইহা ঠিক দেখা নয়, ভুল দেখা,—( কিন্তু এগুলি চিন্তা করিয়া বাহির করা নয় )।

আমি তাঁহাকে ভারতীয় বিজ্ঞানের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষের রসায়নে দ্বৈত গতি ছিল ( স্বভাবিক ভাবেই নাম ছিল না ),—একটি গতি পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে ও যে-মন সেগুলিকে কল্পনা করিত তাহাতে আরোপ করিত,—অন্য গতি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবেই স্বরূপেই পদার্থকে পর্যবেক্ষণ করিত, এবং ওই তত্ত্বটি নিষ্কাশিত করিয়াছিল। কোন পদার্থই চরম ভালো বা চরম মন্দ নয়, প্রত্যেকটিই ক্ষেত্রানুসারে ( বা মাত্রানুসারে ) ভালো বা মন্দ। যেমন, গোখুরা-সাপের মারাত্মক বিষ কোন-কোন রোগে মুমূর্ষ রোগীকেও সঞ্জীবিত করিতে এবং বাঁচাইতে পারে। ( জগদীশচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করেন মনে হয়; —কিন্তু প্রচলিত এই রীতিকে ইংরেজরা নিষিদ্ধ করিয়াছে, তাহারা বিষের ব্যবহারই নিষিদ্ধ করিয়াছে। )

তিনি সম্প্রতি আমাকে যে-বই পাঠাইয়াছিলেন, এক সময় তাহা তিনি হাতে তুলিয়া লইলেন; ইহা তাঁহার সর্বশেষ প্রকাশিত বই; 'প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ অ্যাণ্ড রিলেশন্‌স্' ; —ইহাতে তিনি তাঁহার আবিষ্কার-গুলির মূল কথার সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। তিনি আমাদের বাগান হইতে তুলিয়া আনা কয়েকটি গাছ হাতে লইয়া সেগুলির কিছু কিছু অংশ ব্যাখ্যা করিলেন। সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গৃহ-পালিত হাঁস-মুরগীর সহিত ও বাগানের শাক-সবজির লক্ষণীয় ভাবে অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের সংবেদনশীলতা ( বা প্রতিক্রিয়াগুলি ) ভয়ংকর রূপে হ্রাস পায়;—এবং লজ্জাবতী লতা ও বাজপাখির সংবেদনশীলতা অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠে। তিনি লজ্জাবতী লতার একটা ডগার চারটি স্নায়ু দেখাইলেন, দেখাইলেন কেমন করিয়া

প্রত্যেকটি স্নায়ু একটি পাতাকে চালাইতেছে এবং প্রত্যেক পাতায় রৌদ্রের স্পর্শে সৃষ্ট উপরের ও নিচের সংকোচন-প্রসারণের অবিরাম নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তিনি ভারতীয়দের মতোই গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ এবং তাহা তিনি মোটেই গোপন করেন না। (পৃথিবীর সমক্ষে তখন তাঁহার যে আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি ইহা গোপন করেন না।) তিনি নিঃসন্দেহ যে, জীবন এবং জড় গতিশীল : এবং আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব ও অজৈব (বলিয়া কথিত) পদার্থের সমস্ত ছুনিয়ার মধ্য দিয়া আমাদিগকে এক রূপ হইতে অন্য রূপে লইয়া যায়। পরিণামে তিনি সমস্ত অস্তিত্বকেই অঙ্গীভূত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : "আমি যদি উদ্ভিদ্ না হইতাম— তাহাকে বুঝিবার জন্য যদি আবার উদ্ভিদ্ না হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমার মনকে আবিষ্কার করিতে পারিতাম না।" তাহার ফলস্বরূপ মানবতার ঐক্য তাঁহার নিকট একটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু ; ব্যক্তিগত বুদ্ধিহীন অহংকারই ইহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।—মাত্রা হইতে মাত্রায় মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, প্রথমে করিয়াছে জীবনের অন্য শ্রেণী হইতে, তারপর করিয়াছে মানুষের অন্যান্য জাতি হইতে, তারপর একই জাতির অন্যান্য মানুষ হইতে, তারপর অন্যান্য ব্যক্তি হইতে—এবং অবশেষে তাহার মধ্যে বানাইয়াছে মরুভূমি।

সমাজ-বিপ্লব বা রাজনীতিতে আগ্রহী হইবার পক্ষে তিনি অতি বেশী বৈজ্ঞানিক-ভাবাপন্ন। তাঁহার চোখে প্রকৃতি তাহার চিরনির্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিয়া চলে, আর অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান-পতন ঘটে।—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা অনেক বেশি দূরদর্শী, যাহারা কলকাঠি নাড়ে তাহাদের ফাঁদে তিনি ধরা দেন না। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে মুসোলিনি-প্রেরিত ইতালি আসার জন্য নিমন্ত্রণ তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।—জাতিসংঘের মিথ্যার মুখোস খুলিয়া দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নাই ; যে সমস্ত বুদ্ধিমান

এশীয়কে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের মতোই জাতিসংঘকে তিনি অতিশয় অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন।

বিবেকানন্দকে তিনি খুব ভালো করিয়াই জানিতেন (এবং রামকৃষ্ণকে তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সত্যকার পরিচয় ছিল না)। বিবেকানন্দকে তিনি ভালোবাসিতেন, বিবেকানন্দও তাঁহাকে ভালোবাসিতেন। (শুনিয়া খুশী হইলাম) তাঁহার মধ্যে জাতীয়তাবাদী-প্রবণতা দেখিতে পাইতেছেন মনে করিয়া বিবেকানন্দ এক সময় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি লইয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদ দেখান। যাঁহারা বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মতোই জগদীশচন্দ্রও সেই সম্মোহিনী-শক্তির কথা বলিলেন, যে সম্মোহিনী-শক্তি জীবন ও বুদ্ধিতে উচ্ছল এই ব্যক্তিত্ব বিস্তার করিত। কিন্তু পরিপূর্ণরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই বড় তাড়াতাড়ি তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতীয় অলৌকিক ক্রিয়া-সংঘটক ভেলকিবাজি-দেখানো সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে—যাহারা যুক্তি ও ইচ্ছা-শক্তির সংযমকে আদৌ সংযুক্ত করে না, তাহাদের সকলের সম্পর্কে,—বিবেকানন্দের মতো (এবং আমার বিশ্বাস, রামকৃষ্ণের মতোও) তাঁহার গভীরতম অবজ্ঞা আছে। প্রেততাত্ত্বিকদের মনের অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও অলসতা সম্পর্কে (তাঁহাদের মতোই) তিনি করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে কথা বলেন। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পড়ার পর বন্ধুকে ইহা বলিতে শুনিয়া আমার কাছে ইহা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের মহৎ স্বতঃলব্ধ ধর্মীয় বোধের (যাহা তুরীয় আনন্দ পর্যন্ত যাইতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হইতেছে সর্বদা বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ; এবং সাময়িক ভাবে হইলেও, যাহা কিছু বুদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়ায়, তাহার প্রতিই তাহার বিতৃষ্ণা। কিন্তু কিভাবে তাঁহারা স্বচ্ছ বুদ্ধি ও অন্তর দর্শনকে একই সঙ্গে মেলান, তাহা এখন বিজ্ঞান, যাহা সর্বাধিক বুদ্ধিমান ইউরোপীয়রাও মোটেই অনুমান করিতে পারেন না—(দেহের একাংশ বা সারা দেহে সংবেদন-

শীলতার প্রণালীগুলি নিজের ইচ্ছামতো খোলা বা বন্ধ করার জন্য যে শক্তি মন আয়ত্ত করিতে পারে, বা মনকে আয়ত্ত করিতে হয়,—সেই শক্তির কথা জগদীশচন্দ্র আমাদিগকে এক মুহূর্তে বলিয়া দিলেন, ইহা লক্ষণীয়। )

—তাঁহার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য কয়েকখানি বই নাম স্বাক্ষর করিয়া উপহার দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং অনুরোধ করিলেন, মনের যে আত্মীয়তা আমাদিগকে এক করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য বহন করিয়া একখানি চিঠি দিতে, যাহা তিনি তরুণদের হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন।

তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বসু বিজ্ঞান-মন্দিরকে দান করিয়াছেন। ( তিনি নিঃসন্তান। ) তিনি কিছু ছাত্রকে দশ বৎসর শিক্ষানবিসির সময়ে বৃত্তি দেন। তিনি বলিলেন, তারপর যখন তিনি মনে করেন যে, তাহারা নিজেরা চালাইয়া যাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি চান, তাহাদিগকে তাহাদের সারা জীবনের জন্য এমন এক পর্যাপ্ত বৃত্তির নিশ্চয়তা দিতে যাহাতে তাহারা বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সকল বৈষয়িক উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে। কিন্তু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিটি আবিষ্কার পৃথিবীকে দিতে হইবে। কোনটিরই গোপনতা বা পেটেণ্ট রাখা চলিবে না। কারণ, তিনি বলেন, বিজ্ঞানের একমাত্র তাহাই ভালো, যাহা সকলকে দেওয়া যায় এবং যাহা রাখিতে হয়, তাহাই মন্দ ( বিস্ফোরক পদার্থ, মারণাস্ত্র প্রভৃতি )।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমাকে জানাইলেন, স্বামী সারদানন্দ সম্প্রতি মারা গিয়াছেন ( সারদানন্দ রামকৃষ্ণের জীবনীকারদের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ) এবং রামকৃষ্ণের এখনও জীবিত প্রত্যক্ষ শিষ্য হইলেন স্বামী শিবানন্দ। তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড়

মঠের প্রেসিডেন্ট। তাঁহার বয়স ৭০ বছর। তাই তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বেশি দেরি করা চলিবে না।

আমি স্বামী শিবানন্দকে লিখিলাম (১২ই সেপ্টেম্বর)। রামকৃষ্ণের নিকট যন্ত্রণা সমস্যাটি কী ছিল, বিশেষভাবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে, সেবা'র প্রশ্ন সম্পর্কে কিছুদিন আগে আমি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়িয়াছি (পড়িয়া শুনাইয়াছে আমার বোন)। সেখানে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শুধুমাত্র তাঁহার গুরুর মতবাদ হইতে—সমস্ত মানুষের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি হইতে—তাঁহার মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, তবু বিবেকানন্দের মধ্যে আরও অপরিহার্য যাহা ছিল, তাহা হইতেছে বিশ্বজনীন যন্ত্রণা সম্পর্কে—এবং যে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে বা সান্ত্বনা দিতে হইবে, তাহার সম্পর্কে—বেদনাকাতর ও বীরোচিত সুগভীর এক আচ্ছন্নতা-বোধ। যাহা রামকৃষ্ণকে এক পরমানন্দে, অনন্তের এক বিশ্বাসে সদাহাস্যময় করিয়া রাখিত। সেই বিশ্বজনীন দিব্যদর্শন হইতে ইহা কি যথেষ্ট স্বতন্ত্র এক কেন্দ্রীয় বোধ নয়? প্রকৃতি ও সমাজের নিষ্ঠুর অবিচার সম্পর্কে,—হতভাগ্য, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের সম্পর্কে—তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল? তিনি কি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে চাহিতেন না? কিংবা তিনি কি তাঁহার মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দকে এই কার্য সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দেন নাই?

অক্টোবর, ১৯২৭॥

—স্বামী অশোকানন্দের এক দীর্ঘ ও কৌতূহলোদ্দীপক পত্র আসিয়াছে। চিঠিখানি রামকৃষ্ণ আশ্রমের বর্তমান অবস্থা ও বৃহৎ সামাজিক সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইয়া সম্প্রদায়ের অবস্থান সম্পর্কে।

যথাযথ ও প্রমাণপত্র-সম্বলিত প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত পরিপূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ। ইহাকে আমি আমার পুস্তকের ভাবী পরিসমাপ্তিতে কাজে লাগাইব।

৪ অক্টোবর আমি স্বামীজীকে উত্তর দিলাম। তাঁহার চিন্তার একটি দিক্ লইয়া তর্ক তুলিলাম। তাঁহার বিশ্বাস, আজিকার দিনে বৈদান্তিক ও পাশ্চাত্যের কোন কোন চিন্তা-ভাবনা বা প্রবণতার মধ্যে যে আত্মীয়তা দেখা যাইতেছে, তাহা ঘটিয়াছে একমাত্র বৈদান্তিক ভাবধারার সাম্প্রতিক প্রচারের ফলে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে "এই আত্মীয়তা নির্ভর করিতেছে মানবপ্রকৃতির ভিত্তির উপরে এবং সর্বোপরি বিশাল ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অভিন্ন ভিত্তির উপরে।"—আমার মনে পড়ে, প্যাসকালের কথা: "যদি আমাকে না পাইতে, তুমি আমাকে খুঁজিতে না।"

"আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করে এমন কোনও উপলব্ধির কথা যখন আমি কোনও ভারতীয় গ্রন্থে পড়ি, তখন আমি তাহাকে কোনও নূতন চিন্তা বলিয়া আবিষ্কার করি না। তাহাকে আমারই লুকাইয়া-থাকা একটি গোপন চিন্তা বলিয়া চিনিতে পারি। যদি ভাবি যে, তাহা নির্বাচিত-করা এক জাতির নির্বাচিত-করা কতিপয় মানুষের সৃস্ট বীজ, তবে তাহাতে দিব্যকেই, অনন্তকেই খর্ব করা হইবে। মানবতার সকল ভূমিতেই অনন্ত আপনাকে মুঠা মুঠা ছড়াইয়াছেন বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে মাটি সর্বত্র সমান প্রস্তুত নহে। এখানে গজায়, ফলপ্রসূ হয়, ওখানে সুপ্ত থাকে। কিন্তু বীজ সর্বত্রই আছে। এবং পর্যায়ক্রমে,—যাহা সুপ্ত ছিল তাহা জাগিয়া উঠে, আর যাহা জাগিয়া ছিল তাহা ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে।—এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে, এক মানুষ হইতে অন্য মানুষে, অনন্তের শক্তি সর্বদা সঞ্চরমাণ রহিয়াছে। কোনও একটি জাতি, কোনও একটি মানুষ, ইহাকে ধারণ করে না; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত

জীবনের অগ্নি,—এবং একই অগ্নি। আর আমরা বাঁচিয়া থাকি ইহারই ইন্ধন যোগাইতে।”

(তারপরই আমি তাঁহাকে বিভিন্ন উৎসের রূপরেখা দিতে চেষ্টা করিয়াছি, যেসব উৎস হইতে পশ্চিমে সেই দুইটি নীতি আসিতে পারিয়াছে,—যেগুলিকে তিনি নাম দিয়াছেন বৈদান্তিক নীতি; মানুষের দিব্যভাবের ও জীবনের মধ্যে আত্মিকতা। আমি সেগুলিকে কোন বিশেষ ধরনের অতীন্দ্রিয় খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে,—গ্রীক সংস্কৃতির একটি অংশের মধ্যে—খুঁজিয়া পাই (প্রাচ্যের সহিত গ্রীক সংস্কৃতির বন্ধন ছিল)। আমি সেগুলিকে খুঁজিয়া পাই “ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদের এই উদার উৎস”: সঙ্গীতের মধ্যে,—এই অধিবিদ্যা এবং এই চিন্তানিরপেক্ষ ধর্মের মধ্যে,—এই রহস্য-উদ্‌ঘাটনকারী ‘যোগের’ মধ্যে।—“আপনি যদি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, অনন্তে অভিনিবিষ্ট ও সমাহিত হইবার কঠিন শিক্ষাও পাশ্চাত্যের আছে। জে. এস. বাখের এক ধর্মসংগীতের সমুদ্রবৎ বিশাল ঐকতানে নিমগ্ন হইয়াছে এমন জার্মান জনতার মূর্তি পরমানন্দের নীরব জ্বলন্ত তীব্রতায় ভারতবর্ষের সর্বাধিক সর্বগ্রাসী ভক্তির সমতুল্য।”—বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে স্পিনোজা হইতে যে ধারা আসিয়াছিল এবং শতাব্দীকাল পরে গ্যেটের মধ্যে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান ভাববাদীদের যে ধারা পুরাপুরি কাজ করিয়াছিল,—তাহার কথাও যোগ করিয়াছি···“বলিতে পারা যায়, যে মনীষীরা ফরাসী বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও বিশ্বাসের মৌল ভিত্তি ছিল মানুষের দেবত্ব। যে ত্বরান্বিত দ্রুত ক্রিয়া অবজ্ঞাত হিংসাশ্রয়ী মানুষের জনতাকে উদ্বোধিত করিয়াছিল, তাহারই বিপর্যয়ে ফরাসী বিপ্লব রক্তে ও রৌপ্যের স্রোতে ডুবিয়া গেলেও—বিশ্বাসের মৌল ভিত্তি অক্ষত ছিল একদল শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে। আমি শৈশবেই তাহা আমার পূর্বসূরীদের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছি। আমার ক্ষেত্রে আমি উহাকে হস্তান্তরিত

করিতেছি।—রহস্যময়ী, ধ্যানময়ী, শ্রেষ্ঠা ইউরোপ শ্রেষ্ঠা এশিয়ারই সহোদরা। উভয়ের মধ্যেই একই ঈশ্বরের শোণিতধারা প্রবাহিত। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার ভগিনী যে সংগ্রামগুলিতে অংশ লইয়াছে, সেই নীরব সংগ্রামগুলি এশিয়া দেখে নাই, দেখে নাই সহস্রবর্ষের পুরাতন পথটি, যে পথে সে তাহার রক্তের, তাহার ঈশ্বরের বীজ ছড়াইয়াছে…।"

সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৭ ॥

—দিলীপ রায় সম্প্রতি কয়েক মাস ইউরোপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন। তিনি এক অপরাহ্নে ভিলন্যভে আসিয়াছিলেন। তিনি আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিলেন—তাঁহার কিছুটা সরস সরল আলাপপূর্ণ চিঠিপত্রের মধ্যে তিনি যে রেখাপাত পূর্বে করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক গভীরতম রেখা। চমৎকার তরুণ—বুদ্ধিমান, সরল, আলাপে ও আচরণে নম্র, শ্রেষ্ঠ অভিজাত ভারতবর্ষের একটা টাইপ।—তিনি সম্প্রতি অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে পড়িয়াছেন। তাঁহার সহিত ইঁহার সম্পর্ক আছে, তাঁহার অনেক কথা ইনি আমাকে শুনাইলেন। নির্জনবাসে অরবিন্দ তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অনুসরণ করিতেছেন, তিনি আশা করেন উহা হইতে তিনি মনকে নিংড়াইয়া এক অভিনব শক্তিলাভে সমর্থ হইবেন; তাহা মানুষের মনে দিব্য ও অনন্ত শক্তির একপ্রকার প্রত্যক্ষ সংক্রমণ ঘটাইতে পারিবে, তাহাতে দেহ উপকৃত হইবে, এবং তাহার ফলস্বরূপ মানব-জাতির মধ্যে এক আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটিবে (অবশ্য, বৃহত্তর সংখ্যায় তাহা সাধারণীকৃত হইবে না, তাহার উপলব্ধি ঘটিবে একদল অভিজাত মানুষের মধ্যে)…চিরকাল এই অদ্ভুত স্বপ্ন,—এই মুহূর্তে তাহা জাগিতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেইসব মানুষের মনে, যাঁহারা একে অন্যকে চেনেন না, যাঁহারা খুবই স্বতন্ত্র, অ্যানী বেসাণ্ট, পল রিশার প্রভৃতি। সেই প্রতীক্ষিত 'মহামানব' পুরোপুরি নীট্‌শের অর্থে

মহামানব নন (অরবিন্দ কিন্তু নীট্‌শেকে জানেন এবং তাঁহাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেন)—অর্থাৎ সেই মহামানব নিহত শিকারের উপর দাঁড়ানো 'অট্টহাস্যময় সিংহ' নন, তিনি মানবিক ধরনের নূতন ও উন্নত স্তরের শক্তিসম্পন্ন,—তিনি একটি নূতন স্তর টপকাইয়া যাইবেন, যে স্তর বর্তমান মানবতা হইতে ততটা দূরে, যতটা দূরে রহিয়াছে সেই পশুভাব হইতে বর্তমান মানবতা—যাহা হইতে তাহা নির্গত হইয়া আসিয়াছে। —ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার মনে সাড়া পাইলাম না, এই স্বপ্নালুতা আমাকে আকর্ষণও করিল না। কিন্তু এক দেশ হইতে অন্য দূরবর্তী এক দেশে এইসব বিষয়ের বিকাশকে আমি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতেই দেখি; তাহা হইতে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা নিঃসন্দেহে মনের ঐতিহাসিক উদ্‌বর্তনের এক প্রচ্ছন্ন নিয়মের সাড়া। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, না রুগ্‌ণ আকার? আমি জানি না। কিন্তু সাধারণ নিয়ম। সুতরাং তাহার পরীক্ষা প্রয়োজন। আগুনের উপর টেস্ট-টিউব, তরল পদার্থ গাঁজিয়া উঠিতেছে, কি নিঃসারিত হইবে তাহা হইতে?—অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার গভীর বৈদিক জ্ঞানকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সহিত মিলিত করিয়াছেন; মনে হয়, তিনি পূর্ব হইতে ফলাফল ঘোষণা না করিয়াই নিজে তাঁহার অভিজ্ঞতাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন; তিনি ইহার বিপদ জানেন, কারণ, তিনি শিষ্যদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তিনি দিলীপ রায়কে বলিয়াছেন: "এমন হইতে পারে, আমি ইহার ফলে পাগল হইয়া গিয়াছি।" কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এই অভিজ্ঞতা এমন এক কর্তব্য, যাহা মানবতার খাতিরে তাঁহাকে স্কন্ধে লইতে হইয়াছে। (ভারতবর্ষের প্রাচীন অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতোই অনাগ্রহী হওয়া অসম্ভব।) ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, দেহ সম্পর্কে—নিজের দেহ সম্পর্কে—তিনি অস্বাভাবিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, এখন তিনি নিশ্চিত যে, পূর্ণ বয়সের পূর্বে—অর্থাৎ চরম অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বে—দুর্ঘটনায় বা ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু

হইবে না।—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার পরিকল্পিত কাজ লইয়া আলোচনা হইল। তিনি আমাদের উৎসাহে অংশ লইলেন এবং অরবিন্দের নিকট রামকৃষ্ণের কী মূল্য, তাহাও বলিলেন। তিনি নিজে রামকৃষ্ণের স্ত্রীকে ( যিনি তাঁহার নিকট প্রশান্ত মাধুর্যের শুধু এক স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন ) এবং রামকৃষ্ণের অনেক প্রত্যক্ষ শিষ্যকে জানেন। লণ্ডনে বাস করেন এমন এক ভারতীয়কে লেখা তলস্তয়ের একখানি চিঠির কপি তিনি আমাকে পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাহাতে তলস্তয় বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ আমরা সংগীত সম্পর্কেও আলোচনা করিলাম। দিলীপ রায় পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি খোলা মনের পরিচয় দিলেন। অন্য সময় এইরূপ দাবি-করাকে তিনি তাঁহার জাতীয় (জাতীয়তাবাদী) সম্মানের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন, মনে করিতেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত অন্য সমস্ত সঙ্গীতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র ভারতীয়রাই তাহা বুঝিতে পারে। তখন আমি তাঁহাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ভারতীয় সংগীত প্রাচীন ইউরোপীয় সংগীত হইতে পৃথক্ হইয়াছে একই উদ্‌বর্তনের পরিণামের ফলে। এখন তিনি ভিয়েনায় খুবই সাফল্যের সহিত ভারতীয় সংগীত শুনাইয়া আসিয়াছেন ; তাই তিনি স্বীকার করিলেন, তাঁহার দেশের শিল্পকলা হইতে ইউরোপ ততখানি অনতিক্রমণীয় ভাবে দূরবর্তী নয়। তিনি একথাও স্বীকার করিলেম, নিজের অজ্ঞাতেই তিনি ইউরোপীয় সংগীতের কোন কোন উপাদান নিজের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিয়াছেন এবং অসচেতনভাবে তাঁহার সংগীতে সেগুলিকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি নিজের লেখা দুইটি গান গাহিয়া শুনাইলেন, অবশ্যই সেগুলি মাধুর্যপূর্ণ। তারপরই তিনি গাহিলেন কালীবিষয়ক একটি প্রাচীন গীত, গীতটি উনবিংশ শতকে বা তাহারও পূর্বে রচিত, এবং তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী ; :আবেগের এক-একটি গ্রন্থি-মোচন ঘটিতেছে—মিনতি জানাইতেছে, শোকার্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্ষুব্ধ হইতেছে, চড়া হইতে

খাদে নামিয়া আসিতেছে, বারবার মনে হইল শেষ হইয়াছে, বারবার তাহা আরম্ভ হইল নূতন করিয়া, অতৃপ্ত আনন্দের তীব্রতা লইয়া। এই সংগীতে আমি আরবীয় প্রভাব দেখিতে পাইতেছি; এবং সে সম্পর্কে কোন সংশয় আছে বলিয়া মনে হয় না।

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে বইটি লিখিতে চাই, আজ তাহা গুছাইতে শুরু করিলাম: ইহাতে আমার নিজের ধর্মীয় ধারণাগুলি খুলিয়া ধরিবার একটা সুযোগ মিলিবে।

ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

—রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত পত্রালাপ চলিতেছেই। স্বামী অশোকানন্দের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়, তাহার সহিত আছে তাঁহার যথাযথতা,—যাহা প্রাচ্যদেশীয় নয়। অত্যধিক দলিলপত্র দিয়া প্রমাণ-করা বিশুদ্ধ নিবন্ধাবলীর মাধ্যমে তিনি শুধু আমার সকল প্রশ্নের উত্তরই দেন নাই, সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। এইভাবেই তো আমি ভগিনী ক্রিস্টিনের পত্র পাইয়াছি; পত্র পাইয়াছি পণ্ডিত বশী সেনের,—তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভুল বর্ণনা দিয়া আমার জন্য কষ্ট করিয়া প্রতিটি পঙ্‌ক্তি একত্র করিয়া দিয়াছেন।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

—'য়ুরোপ' পত্রিকার তরুণ ও সহৃদয় সচিব জাক্ রবেরফ্রাঁসের সহিত কৌতূহলোদ্দীপক পত্রালাপ।…'য়ুরোপ' পত্রিকায় ঘোষণার জন্য আমার আগামী রচনার নাম তাঁহাকে জানাইলাম: 'নরদেবতা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মবাণী'।

৩০শে আগস্ট, ১৯২৮॥

মধ্যাহ্নভোজন ও কিছুটা অবসর বিনোদন করিতে আসিয়াছেন রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ পণ্ডিত বশী সেন। মুখখানি দৃপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, অত্যন্ত আকর্ষণীয়; নিগ্রো ইতালীয় টাইপ; কৃষ্ণচাঁচর কেশদাম—যেন নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বৎসরের অর্ধেকখানি সময় কাটান আলমোড়ায়, অপর অর্ধেকখানি কলিকাতায়। একই সঙ্গে তিনি তাঁহার ধর্মীয় ও গবেষণাগারের কাজকর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের ছয় বৎসরের ছাত্র। (সম্প্রতি প্রোটোপ্লাজমের উপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে একটি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।)—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্যের (এক স্টেশনমাস্টার) নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁহার গুরু। এক সময়ে যখন তাঁহার বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ছাড়িয়া ফেলার ইচ্ছা হইয়াছিল, তখন যিনি তাঁহাকে তাহা চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, তিনি হইলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মানন্দ; কারণ, তাঁহার নিজস্ব মৌলিক মানসিক শক্তির অনুশীলনের মধ্য দিয়াই তাঁহার পূর্ণাঙ্গতর মন ঈশ্বরের অতিশয় সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারিবে। বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; রামকৃষ্ণের সঙ্গেও না; কিন্তু রামকৃষ্ণের বিধবা-পত্নী 'শ্রীমা'কে তিনি ভালোভাবেই জানিতেন, তাঁহার সম্পর্কে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণভাবে তিনি কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, শুধুমাত্র তাঁহার উপস্থিতি, তাঁহার হাসিই তাঁহাদের দিব্যানন্দে অবগাহনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের অন্তরঙ্গ। পাশ্চাত্যের সমস্ত রমণীদের মধ্যে ক্রিস্টিনই ছিলেন বিবেকানন্দের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি। বশী সেন ক্রিস্টিনকে দিয়া অন্ততঃপক্ষে স্মৃতিকথার টুকরো টুকরো কথা লিখাইবার মনঃস্থ করিয়াছেন, এবং সেগুলি সম্পর্কে আমাকে জানাইবেন।—তাঁহার বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম তাঁহার মূল ও সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম হইতে তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করে না, কারণ সেই কর্মই

হইতেছে একদিন ঈশ্বরের ( মনে হয় রামকৃষ্ণের রূপে ) উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া। রাজযোগ যাহা শিখায়,—সেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ, তুরীয়ানন্দ 'উপলব্ধির' প্রণালী—জানিতে তিনি বৈজ্ঞানিক যথাযথতার সহিত কম অনুসন্ধান চালাইতেছেন না। এবং সমস্ত লৌকিক কাহিনী বর্জন করিয়া—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিশুদ্ধ পরিচয়টি পুনরুজ্জীবিত করিবার সেই বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয় বস্তুটিও তাঁহার মধ্যে আছে। রামকৃষ্ণের জীবনকে 'রোমান্স' করিয়া তুলিবার জন্য তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ক্ষমা করেন নাই। একজন ভারতীয় একই সঙ্গে কোন ব্যক্তির দেবত্বে পরম বিশ্বাসী এবং বিনা আপসে সেই ব্যক্তির দৈহিক, এমন কি নৈতিক, বাস্তবতারও ( তাহা হইলে আমাকে বলিতে হয় মায়ার ) পর্যবেক্ষক হইতে পারে। বশী সেন তাঁহার কথা আনন্দোচ্ছল অন্তরঙ্গতার সহিত বলিলেন। বলিলেন, রামকৃষ্ণকে তাঁহার সর্বাধিক অনুরক্ত শিষ্য 'বুড়া কর্তা', 'দেড়ে',—'পরমহংস' বলিয়া ডাকিতেন। বিবেকানন্দের প্রতিভার পূজারী হইলেও বিবেকানন্দের স্বভাবের স্ববিরোধিতা ও অসংগতিগুলিকে হাসিতে হাসিতে বলিয়া ফেলিতেও বশী সেনের বাধিল না ; এই স্বভাবের আচরণ পরদিন কী হইবে তাহা কেহ, (এমন কি বিবেকানন্দ নিজেও) আগে হইতে বুঝিতে পারিতেন না। হতবাক্ ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : "কিন্তু স্বামীজী, গতকাল আপনি উল্টা কথা বলিয়াছিলেন।" —তাহাতে বিবেকানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন : "নিঃসন্দেহে। গতকাল ছিল গতকাল।" এমন স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পরের পরিপূরকরূপে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁহাদের শিষ্যদের মনে এক অখণ্ড একত্ব লাভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ নিজে বলিতেন : "আমি শক্তিমান্, সে শক্তি।" "আমি মেয়েছেলে, সে ব্যাটাছেলে।" রামকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের আধারে বিশ্বজনীন উপলব্ধির বিকিরণ। আর বিবেকানন্দ ছিলেন সক্রিয় শক্তি। বিবেকানন্দ ছিলেন বুদ্ধি, যাহাকে কিছুই সীমাবদ্ধ বা স্তব্ধ করে না। তাঁহার সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মাকে

বলিয়াছিলেন : "আমার সকল শিষ্যকে মায়ার হাত হইতে মুক্ত কর্। ওকে বাঁধ্ মায়ার বাঁধনে।" কারণ, বিবেকানন্দের এ বিপদ ছিল না যে, তিনি মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবেন, বিপদ ছিল তিনি মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া মানুষকে বুঝি এড়াইয়া যাইবেন। গিরিশ ( তাঁহাকে বশী সেন ভালো করিয়া জানিতেন ; তাঁহার শেষ অসুখের সময়ে তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন ) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সহিত বলিয়াছিলেন : "শুধু দু'জন মায়ার বেড়ি ফসকে গেল ; একজন বিবেকানন্দ, কারণ সে খুব বড় ; অন্যজন নাগ মহাশয়, কারণ সে-লোকটা খুব ছোট ( বা নিজেকে খুবই ছোট মনে করেন )।"—বশী সেন বলিলেন : "সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচালক শিবানন্দের আছে এক স্নিগ্ধতা এবং প্রশংসনীয় প্রশান্তি ; যেন বুদ্ধের দুই হাত সর্বদা প্রসারিত। এবং তিনি যেদিন হইতে সম্প্রদায়ের শীর্ষে বসিয়াছেন, সেদিন হইতে ঐরূপ হইয়াছেন। তিনি আগে বরং রূঢ় ও কঠোর ছিলেন। কিন্তু এইসব বড় বড় সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, তিনি যে কর্মের যোগ্য, সেই কর্মের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠে।

জুনের শেষ, ১৯২৮ ॥

—ভিল্‌ন্যভে ফিরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার দুই খণ্ডের কাজ শুরু করিয়াছি, 'বিবেকানন্দ' লিখিতেছি।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ ॥

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু আসিয়াছেন। ( লা কলিনে স্বল্পকালীন চিকিৎসা করাইয়া আসিলেন। ) আগের অপেক্ষা তিনি ( জগদীশচন্দ্র ) অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। আমার ভগিনী তাঁহার কথাগুলি যাহাতে অনুবাদ করিতে পারেন, সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে ঈষৎ থামিতে না হইলে তিনি একনাগাড়ে দু ঘণ্টা কথা বলিয়া যাইতেন। সুন্দর ভারতীয় পরিচ্ছদে ধীর স্থির লেডী বসু

শুনিয়া চলিলেন, শুধু একটা-ছুটা কথা সংশোধন করিয়া দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করিলেন। "কর্মতৎপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশজন ইউরোপীয়কে চ্যালেঞ্জ করি"—জগদীশ-চন্দ্রের একথা বলিবার সঙ্গত কারণ আছে।—তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি;—বিবেকানন্দও ঐ একই ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক ছিলেন। (তিনি নিজেই এই সমবর্ণের কথা স্মরণ করেন।) ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিবেকানন্দকে জানিতেন এবং তাঁহাকে খুব ভালোবাসিতেন। তিনি বিবেকানন্দের বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভা-দীপ্ত বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যেমন বিনয়ের ব্যাপারে তাঁহার আতিশয্য ছিল না।..."জগদীশচন্দ্রের-ও নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের মূল্য সম্পর্কে এই চেতনা স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত; মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা এই চেতনাকে সহমর্মী করিয়া তুলে। সাদৃশ্যের অপর লক্ষণ, বিবেকানন্দ বলিতেন: "দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন করা যেমন খুব ভালো, তেমনি খুব ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করা-ও; সব কিছুরই একটা সময় আছে; আজ আমীর, কাল ফকির।" জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও সমুজ্জ্বল সমস্ত শক্তির গুণকীর্তন করিলেন,—কিন্তু তাহা নিজের জন্য নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্য। গান্ধীজীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতিতে বা অনাড়ম্বর জীবনে ফিরিয়া যাইবার বাণীর প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই।—তিনি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অতি-শক্তিমান্ মূর্ত প্রকাশ; সেইজন্য তিনি প্রগতির—পিছনে না ফিরিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইবার—ঘোষিত প্রবক্তা না হইয়া পারেন না। তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পবিকাশের পক্ষে; বলিলেন, ইহাকে আটকাইতে ব্যর্থ হইয়া গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানী নকল মাল ডাকিয়া আনার কাজে লাগিয়াছে; ইহার মধ্যেই জাপান পাকা হাতে প্রস্তুত মেকি 'মেইড্ ইন্ টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় গর্ব,—কিন্তু শুধু ভারতীয় নয়, বঙ্গীয় গর্ব—

তাঁহার মধ্য হইতে বিদ্যুতের মতো মাঝে মাঝে ঝলসিয়া উঠে। বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার মনের মধ্যে আছে বাঙ্গালী চরিত্রের বিশিষ্টতা এবং, অবশ্যই তথাকথিত, ভীরুতা সম্পর্কে ইংলণ্ডের (বিশেষতঃ কিপ্‌লিংয়ের) দারুণ অসম্মানেব কথা। বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রসুপ্ত আছে, তিনি তাহার সাক্ষ্য দিলেন এবং আমাদের কিছু কিছু দৃষ্টান্তও দিলেন। আমাদিগকে বলিলেন: "একটা জাতিকে বীর বা ভীরু যাহা বলা হয়, সে তাহাই।" (এবং কথাটাও বিবেকানন্দের।) যেদিন হইতে নিজের সাহস সম্পর্কে বাংলাদেশের চেতনা হইয়াছে, সেদিনই সে তাহা পাইয়াছে। তিনি আমাদিগকে সাম্প্রতিক কালের (রাজনৈতিক কারণে) ফাঁসির আসামীদের কাহিনী বলিলেন: ফাঁসির হুকুম পাইবার পর হইতে ফাঁসি হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহাদের যেন বয়স কমিয়া গিয়াছে, শরীর ভালো হইয়াছে। (কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাহা বোধ করিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাহা বলিলেন না,—তাহার কারণ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদিগকে জেলখানায় দেখিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই যে, ফাঁসির হুকুম পাইয়া রাজনৈতিক বন্দীরা তাড়াতাড়ি মরিতে পারিবেন বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন; কারণ, তাঁহাদের পুনর্জন্মে বিশ্বাস হইতে তাঁহারা এই আশ্বাস পান যে, তাঁহারা আবার জন্মগ্রহণ করিবেন এবং নূতন উদ্যমে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আবার সংগ্রাম শুরু করিবেন।)—, জগদীশচন্দ্র বলিলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ড যখন ভারতবর্ষকে সামরিক নির্যাতনের ভয় দেখাইয়াছিল, বন্দুকের গুলী ও গোলার টুকরা লাগিলে কী হইতে পারে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা হইয়াছিল, ভারতীয় জনগণ তাহার আগে হইতেই তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, যাহাতে এসবে তাহারা অভ্যস্ত হইতে পারে। তিনি এক বাঙ্গালীর বর্ণনা করিলেন, তাঁহাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন এবং তাঁহাকে দেখাইলেন জাতির অসীম শক্তির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে। এক স্কুলমাস্টার। একদিন

তিনি একটা চিতাবাঘ উপহার পাইলেন। ভবিষ্যতে তাহার মনিব হইবার জন্য চিতাবাঘটির আচরণ বুঝিতে শুরু করিলেন। ভালো লাগায় আর একটা বাঘ আনাইলেন এবং তাহাকে লইয়াও ঐ একই রকম করিলেন। এদিকে এক মহারাজা একটি দুরন্ত বাঘ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, কেহ তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত না। পশুর উপর এই বাঙ্গালীর প্রতিপত্তির কথা জানিতে পারিয়া মহারাজা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই বাঘটাকে বশ মানাইবার চ্যালেঞ্জ জানাইলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং অস্ত্র না লইয়া বা ঔষধ ব্যবহার না করিয়া খাঁচায় ঢুকিবেন বলিয়া কথা দিলেন। সেই দিনটি আসিল; হাজার হাজার লোককে ডাকা লইল। যে মুহূর্তে তিনি খাঁচায় ঢুকিতে যাইবেন, মহারাজা তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে ও কথা ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন এবং খাঁচার দরজা খুলিয়া ফেলিলেন; জনতা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল, কেহ কেহ মূর্ছা গেল। বিশাল ক্রুদ্ধ বাঘটি লম্ফ দেওয়ার জন্য নিজেকে গুটাইয়া লইল। লম্ফটা আটকাইবার পক্ষে বড় দেরি হইয়া গেল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটিমাত্র কৌশলই আছে; থাবার এক ঘায়ে বাঘ শিকারের ঘাড় ভাঙিয়া দেয় এবং একই সময়ে দ্রুত সজোরে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। তিনি লাফ দিয়া এক পাশে সরিয়া গেলেন, এবং যে মুহূর্তে বিশাল বাঘটা তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল, তিনি অভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিমেষে দেখিয়া লইয়া হাতের কবজি দিয়া তাক করিলেন এবং উল্টাদিকে এমন জোরে ও এমন নির্ভুলভাবে আঘাত করিলেন যে, থাবাটা ঘুরিয়া গেল এবং বাঘটা সোজা খাঁচার শিকের উপর গিয়া পড়িল। আঘাত ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় বাঘটা হতভম্ভ হইয়া গর্জন করিতে করিতে পিছাইয়া গেল এবং আবার লাফ দিল। সেই একই প্রকার বিভীষিকা-সৃষ্টি-করা লম্ফঝম্ফ এবং সেই একই

ভাবে খাঁচার উপরে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়া। এই অভাবিত ঘটনায় বাঘটা এমনই ভয় পাইয়া গেল যে, সে খাঁচার একধারে গিয়া জড়সড় হইয়া বিড়ালের মতো মিউ মিউ করিতে লাগিল।—বাজি জেতা হইয়া গেল। বাঘটা তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইল এবং তিনি বাঘটাকে লইয়া সারা ভারতবর্ষে নিজেকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একবার বৃষ্টিতে ভিজিয়া খাঁচার শিকগুলা পিছল হইয়াছিল। তিনি পড়িয়া গেলেন। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিনি শুধু অর্ধেকখানি উঠিতে পারিলেন, বাঘের ব্যাদিত মুখের মধ্যে নিজের বিশাল কনুইটা বাড়াইয়া দিয়া তাহা বাঘের চোয়ালের মধ্যে খুঁটির মতো ঢুকাইয়া সাহায্য আসা পর্যন্ত বাঘটাকে অনড় করিয়া রাখিলেন। জগদীশচন্দ্র সেই সঙ্গে সেই গল্পটিও শুনাইলেন যাহাতে এই হারকিউলিস তাঁহার জীবনে তাঁহার পেশী ও ঠাণ্ডা মাথার কীরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রামের এক ব্রাহ্মণ সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছেন। এক বদমাস লোক বাহির করিয়া ফেলিল যে, মেয়েটি শৈশবে অপরের বাগ্‌দত্তা হইয়াছিল, তারপর সেই বাগদত্ত লোকটি মারা গিয়াছে। বদমাস লোকটা স্বামীকে ডাকিয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বলিল, না করিলে সমাজের সম্মুখে তাহাকে অভিযুক্ত করিবে এবং সামাজিক ব্যবস্থানুসারে সে সমাজচ্যুত হইবে। সেই স্কুলমাস্টার—সেই বাঘ-ঠেঙানো মানুষটি সংবাদ পাইয়া ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে লইলেন। এক ভোজে তিনি গ্রামের সব ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বাহিরে যাইবার একটিমাত্র দরজার সামনে একটি জলচৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে দিয়া পরিবেশন করাইলেন। জাতের নিয়ম অনুসারে তাঁহার হাত হইতে খাওয়া হইলেই তিনি জাতে উঠিবেন এবং কেহ তাঁহাকে জাত হইতে তাড়াইতে পারিবে না। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা খাইতে অস্বীকার করিল। তখন গৃহস্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভয়ংকর ঘুষি দেখাইয়া বলিলেন: "ঠিক আছে। ঐ তো দরজা। যিনি

আমার দেওয়া অন্ন খাইবেন না, তিনি বাহির হইয়া যান। কিন্তু সাবধান করিয়া দিতেছি; ওখানে পৌঁছিবার আগে আমার ঘুষি খাইয়া যাইতে হইবে।" ব্রাহ্মণরা আবার বসিয়া পড়িল, খাইতে রাজী হইল।—এখানেই কাহিনীর শেষ নয়।—বিশাল বিশাল বন্য-পশুকে বশ মানাইবার কাজে বাংলার এই হারকিউলিস যখন নামিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন: "আমি কেবল চার বছর এই কাজ করিব। তারপর বনে চলিয়া যাইব।" চার বছর পূর্ণ হইবার ঠিক দিনটিতে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

আমি জগদীশচন্দ্রকে 'রাজযোগ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি বিবেকানন্দের লেখা পড়িতেছি এবং এই শক্তিশালী ও আন্তরিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটিকে রূপকথাসুলভ কোন্ কোন অতি-মানবিক ক্ষমতাকে স্বীকার করিতে এবং তাহা শিক্ষা দিতে দেখিয়া বিব্রত বোধ করিতেছি। আমার মতোই একই বৈজ্ঞানিক সংশয় লইয়া জগদীশচন্দ্র ইহার বিচার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়; তাঁহার বিশ্বাস 'রাজযোগে' বিরাট শক্তিলাভ হয়—কিন্তু এক বিশেষ সীমার বাহিরে নয়। –অরবিন্দের উচ্চতর প্রতিভার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাইয়াও, বিশ বৎসর নির্জনবাসে থাকিয়া ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে আলৌকিক ফলের আশা তিনি করিতেছেন, সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন: যদি যোগের মাধ্যমে এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তাহার ব্যবহার করিলেন না, তাহা বোঝা যায় না। আমিও ঠিক এই রকমই ভাবি।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ ॥

—মাদ্রাজের কিলপাংকের এ. এ. পাল বহু পুস্তিকার মাধ্যমে আমাকে এক 'ফেডারেশন অব্ ইন্টারন্যাশন্যাল ফেলোশিপ'-এর

বিষয়ে জানাইয়াছেন যে, ৪-৫ বৎসর ধরিয়া উহা ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার চেষ্টা হইতেছে—অন্ততঃপক্ষে যুবশক্তির একটি সেরা অংশের মধ্যে—বিভিন্ন ধর্মের মিলনকে বাস্তবায়িত করা।—বিবেকানন্দের সেই সর্বক্ষণের চিন্তা! কিন্তু যাহা আমাকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহা এই যে, এই সমস্ত সম্মেলনে যেখানে খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম, থিওজফি, জৈনধর্ম এবং গান্ধীর প্রতিনিধিরা সমবেত হন, সেখানে একবারও বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয় না এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে নীরবে এড়াইয়া যাওয়া হয়। (তাহা ছাড়া, ইহাও লক্ষণীয় যে, মনে হয়, এই মিলনের ভিত্তি হইতেছে এক ব্যৈক্তিক ঈশ্বরের মিলিত বিশ্বাসের উপর—নাম তাহার যাহাই হউক না কেন;—উহার অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে সীমাবদ্ধতা। আর এইদিক হইতে প্রচারের কথাটাও বাতিল করা হয় নাই, যদিও একমাত্র গান্ধী অত্যন্ত মহত্বের সহিত এই বিপজ্জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যাহার যাহা বিশ্বাস তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে দেওয়ার মতো চিত্তের প্রসার চাই। বন্ধুত্বপূর্ণভাবেও কাহারও বিশ্বাসের সংস্কারসাধন চলিবে না; যাহার বিশ্বাস, কেবল সে-ই উহার একমাত্র বিচারক।)—এ. এ. পাল তাঁহার পত্রিকায় আমাকে লিখিতে বলায় আমি উত্তর দিলাম (৩০ সেপ্টেম্বর): "তাহা আমি সানন্দে করিব; কিন্তু আমি বিস্মিত হইতেছি যে, ফেডারেশন আজ পর্যন্ত ভুলিয়া আছে সেই দুই মহান্ ভারতীয়কে—যাঁহারা সর্বধর্মমিলনের কথা কেবল চিন্তাই করেন নাই, বিশালতম, উদারতম ও পরিপূর্ণতম ভাবে তাহার উপলব্ধিও করিয়াছিলেন।—এই ভুলিয়া থাকার মধ্যে এক গভীর অবিচার আছে। যাঁহার প্রেম ঈশ্বরের প্রতিটি রূপকে আলিঙ্গন করিয়াছিল—সেই পরমহংসের পবিত্র মুখচ্ছবি, এবং তাঁহার মহান্ শিষ্যের দুর্বার বাণীর সেই ঝঙ্কৃত প্রতিধ্বনি মনে জাগিয়া না উঠিলে আজ সারা পৃথিবীতে বিশ্বজনীন ধর্মীয় মিলনের কথা বলাই আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।—আমি বুঝি,

তাঁহারা উভয়েই আপনাদের ফেডারেশনের অপেক্ষা অনেক বৃহৎভাবে ধর্মীয় মিলন, এবং এমন কি, ধর্মীয় মনের মিলনের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা সেখানে স্বাধীন যুক্তি ও বিজ্ঞান—সত্যের সকল ঐকান্তিক ও নিরাসক্ত অনুসন্ধানসহ মনের যাহা কিছু দিব্যভাবাপন্ন—তাহাকেই প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন।—এইভাবে আমিও উহাকে অনুরূপ কল্পনা করি। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভক্ত—যাহারা শুধু স্বার্থ বা অলস অভ্যাসবশে ভক্ত হইয়াছে, তাহাদের হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে তাহারা পর্যন্ত—সকলের মধ্যেই বেশির ভাগ সময় ঈশ্বর থাকেন। ঈশ্বর আছেন সেইসব খাঁটি, সৎ ও বীর হৃদয়ে, যাহা যে-কোনও অবস্থায় আকুল হইয়া, কোন কিছুতে পশ্চাৎপদ ও নিবারিত না হইয়া, শিবকে, সুন্দরকে ও সত্যকে খুঁজিয়া বেড়ায় এবং সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। তাহারা ঈশ্বরকে কি নামে ডাকিল বা না ডাকিল, তাহার মূল্য সামান্যই। যাহার মূল্য, তাহা নাম নয়, ঈশ্বরের শক্তি। সক্রিয় না হইয়াও যাহারা মুখে ঈশ্বরের নাম করে, তাহাদের অপেক্ষা ঈশ্বরের নাম না করিয়াও যাহারা তাঁহার শক্তিতে সক্রিয় হয়, তাহারা তাঁহার অনেক নিকট।—আপনাদের সর্বশেষ সম্মেলনে গান্ধীর ঘোষণাবাণীকেই আমি পুরাপুরি সমর্থন করি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রকৃত কর্তব্য এই বিশ্বাসকে অপরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে চাওয়া নয়, আমাদের কর্তব্য অন্তর্জীবনকে গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিজেরাই তাহার জন্য প্রতিদিন যোগ্যতর হইয়া ওঠা এবং এ ব্যাপারে কোনও যুক্তিহীন ও ভেজাল দ্ব্যর্থতাকে স্থান না দেওয়া। যাহারা আমাদের প্রবলতম ও প্রচণ্ডতম কর্মের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের উপর আমরা এইভাবেই আমাদের বিশ্বাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারি। সকলপ্রকার প্রচারের প্রতিই আমার অবিশ্বাস। উহা নিজেই জানে না যে, উহা মনের এক স্পর্ধিত সাম্রাজ্যবাদেরই এক ছদ্মবেশী রূপ।"

অক্টোবর, ১৯২৮ ॥

—বন্ধুরা আমাকে বড়ই ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিলে আমি খুশি হই, কিন্তু আমার নির্জনতার প্রয়োজন আছে, সেই নির্জনতা অনেকদিন ভঙ্গ করা চলিবে না।···

এইসব বিক্ষিপ্ততার মধ্যে আরম্ভ করা দীর্ঘ কাজের সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হওয়া মোটেই সহজ নয়, সেজন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ মনোনিবেশ।—তথাপি প্রতিদিন সকালে আমি এক চরম চাপা উত্তেজনায় চিন্তাসূত্রকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি; ১২ই অক্টোবর 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ'-র প্রথম খসড়ায় ( অসম্পূর্ণ ) সর্বশেষ দাঁড়ি টানিয়াছি।

১৯২৯ ॥

—২০শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩শে মে পর্যন্ত আমার দিনপঞ্জী লেখায় পুরাপুরি ছেদ।—ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার নূতন খণ্ডগুলি ( 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ' ) কপি করিতে এবং টাইপকরা কপি সংশোধন করিতে এই তিন মাস লাগিয়া গিয়াছে।···অবশেষে ২২শে মে আমি থামিয়াছি। দু বছর ধরিয়া জড়ো-করা বিপুল পুঁথিপত্রের বোঝা আমি ঘাড় হইতে নামাইয়াছি।—ইহার মধ্যেই 'য়ুরোপ' পত্রিকা আমার দুই খণ্ডের ( বিশেষতঃ 'বিবেকানন্দের জীবন'-এর ) পাঁচটি প্রবন্ধের সারাংশ ছাপাইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের হিমালয় হইতে প্রতি সপ্তাহে স্বামী অশোকানন্দ উদ্বিগ্ন ও উন্নাসিক সনাতনী নিষ্ঠার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধন পাঠাইতেছেন; কারণ, প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ এখন সমাপ্তপ্রায়।

জুন, ১৯২৯ ॥

—আটদিন হইল স্টক প্রকাশনীকে আমার ভারতীয় গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডের ( 'বিবেকানন্দ ও বিশ্বজনীন ধর্মবাণী' সম্পর্কে ) সম্পূর্ণ

পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছি। যে কাজটি করিতে দুই বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। প্রথম খণ্ড এখন প্যারিসে ছাপা হইতেছে। —আর রামকৃষ্ণ মিশনের অশোকানন্দের সহিত সপ্তাহে সপ্তাহে পত্রালাপ করিতেছি, এই বইটির ইংরেজি অনুবাদ তিনি আবার খুঁটাইয়া দেখিতেছেন। আমার একথা বলাও উচিত যে, তাঁহাদের 'আক্ষরিকতার' ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ঈশ্বরতাত্ত্বিকরা ইউরোপের ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের মতোই খুঁতখুতে, আর রোমের মতোই ভারতীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের নলের মাথার আংটায় আমি ঠিক-ঠিক খাপ খাইব না।

জানুয়ারি, ১৯৩০ ॥

—৬ই জানুয়ারি স্টক প্রকাশন হইতে আমার 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্বজনীন ভগবদ্‌বাণী' প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার প্রকাশ মিলিয়া যাইতেছে ২৯ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসের উদ্বোধনে জহরলাল ও গান্ধীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩০ ॥

—প্রকাশকদের কাছে ( স্টক এবং রামকৃষ্ণ মিশন ) আমার প্রথম খণ্ড 'রামকৃষ্ণের জীবন' পাঠাইলাম। ১৫ই ডিসেম্বর ( ১৯২৯ ) হইতে 'য়ুরোপ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃতাংশ ছাপিতে শুরু করিয়াছি।

মার্চ, ১৯৩০ ॥

—রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় স্বামী শিবানন্দের একটি পত্রের অনুলিপি। তাঁহাকে আমার তিন খণ্ড বই পাঠাইয়াছিলাম। আমার আগামী সংস্করণের কয়েকটি লাইন ( নিচে দাগ দিয়া ) উদ্ধৃতি দিব। কারণ উহাতে রামকৃষ্ণের চিন্তা বিশ্বস্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, লেখার সময় উহাই ছিল আমার চিন্তা।

"স্বামী শিবানন্দ, ২০।২।৩০
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
প্রিয় শ্রীআর. আর.,

গত ডাকে আপনার লিখিত তিন খণ্ড বই আসিয়াছে। সহস্র ধন্যবাদ ...শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্মুখে রক্ত-মাংসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে বিশ্বস্তভাবে আঁকিয়াছেন,—সম্ভবতঃ তাহা যদি পুরাপুরি তিনি না হইয়াও থাকেন। কিন্তু আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহা গাম্ভীর্যময় ও চমৎকার। আমি ভাবিতেছি, তাহা অন্ততঃ কাহাকেও কাহাকেও খাঁটি খ্রীস্টান, কাহাকেও কাহাকেও খাঁটি হিন্দু এবং কাহাকেও কাহাকেও খাঁটি মুসলমান হইতে সাহায্য করিবে— এবং আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান—এ কথা বলিতে পারার মতো অনুসরণযোগ্য পথ তাহাদিগকে দেখাইবে ...

স্বাঃ স্বামী শিবানন্দ"

এপ্রিল, ১৯৩০ ॥

ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কে আমার বইগুলির ব্যাপারে পাওয়া কৌতূহলী পত্রগুলির মধ্যে একটি হইল কন্স্টান্টিনোপলের মাদ্রাসার ( ফরাসী-আরবী উচ্চ মহাবিদ্যালয়ের ) অধ্যাপক জে. এচ. প্রবস্ত্, ডি. লিট্-এর একখানি পত্র ;—উহা লিখিয়া রাখিবার মতো : তিনি লিখিয়াছেন যে, আমার তিনটি খণ্ডই "উদারপন্থী খ্রীষ্টান ও মুসলমান বন্ধুদের নিকট এক সত্য-উদ্ঘাটন। ( প্রবস্তের মতোই ) তাঁহারা মনে করেন যে, রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সারগ্রাহিতা উত্তর আফ্রিকার ইউরোপীয়, ইহুদী ও আরবদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল স্থায়ী জাতি ও ধর্মের ঘৃণাকে হ্রাস করিবার উপায় রূপে কাজ করিতে পারিবে। তাঁহারা টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়াতেও রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিবেন। প্রবস্তের মতোই কাসাব্লাংকা, রাবাত, টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার পত্রালাপীরা ( সরকারী কর্মচারী, দোভাষী, অবসরপ্রাপ্ত

ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের লেখকরা) ইহা করিতে উৎসাহী হইবেন।
—প্রবস্ত্ পরামর্শ চাহিয়াছেন, সেই সঙ্গে ব্রেজিলীয় গোষ্ঠীর ঠিকানা চাহিয়াছেন, যাহাতে তিনি রামকৃষ্ণের ধর্মীয় বাণীর পর্তুগীজ অনুবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা আফ্রিকার ইংরেজি ও জার্মান অনুবাদের অপেক্ষা সহজপাঠ্য হইবে।

ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত প্রবস্তের যোগাযোগ ঘটাইয়া দিয়াছি।

এপ্রিল, ১৯৩০ ॥

—আমার বইয়ে বিবেকানন্দের মূর্তি নূতন করিয়া দেখিতে পাইয়া এমা কাল্‌ভে আমাকে তাঁহার মনের ভাব লিখিয়া জানাইয়াছেন; তাঁহার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন পরিত্রাতা।

জুন, ১৯৩০ ॥

—অডেলওয়াল্ডের 'নববিদ্যালয়ের' শিক্ষিকা শ্রীমতী ভি. কেলের প্রায় এক বৎসর ভারতবর্ষে কাটাইয়া আসিয়াছেন; সেখানে মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। ৫ই জুন তিনি আমাদের সহিত আহার করিলেন এবং তাঁহার পর্যটনের কথা আমাদিগকে শুনাইলেন। কলিকাতার কাছে বেলুড়ে মায়ের বাড়িতে তিনি দুই-তিন মাস কাটাইয়াছেন।—ভারতবর্ষে যে-মূর্তিটি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী গান্ধীর মূর্তি। এমন কি, যে রামকৃষ্ণ মিশনে রাজনীতিকে বাহিরে রাখিতে বাধ্য করা হয়, সেখানেও সমস্ত সন্ন্যাসী—মহারাজ পর্যন্ত—তাঁহার চিন্তায় উদ্ভাসিত, উদ্দীপ্ত সহাস্যমুখে তাঁহার কথা বলেন। শ্রীমতী ভি. কেলের অবশ্য কিছুটা হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যগুলিকেও দেখিতে ও মনে রাখিতে জানেন। (এবং গান্ধীর ওখানে সেগুলির মোটেই অভাব ছিল না;) তিনিও গান্ধীর

ব্যক্তিত্বে অভিভূত হইয়াছিলেন। সর্বোপরি অভিভূত হইয়াছিলেন তাঁহার অতিশয় সরলতায়, বিন্দুমাত্র গোপন-না করা প্রতিটি মুহূর্তের সততায় এবং তাঁহার চারিপাশের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল কিছুর সম্পর্কে মনোযোগী কৌতূহলে। যেসব অঙ্গভঙ্গি হাস্যকর বলিয়া গণ্য, সেগুলিকেও বিনা হাস্যে মানিয়া নেওয়ানোর শক্তি তাঁহার আছে: ( খাওয়ার আগে সকলের সম্মুখে তাঁহার বাঁধানো দাঁতগুলি আনাইয়া লন, শান্তভাবে মাড়িতে পরেন, খাইবার পর সেগুলি খুলেন এবং কাচের গেলাসের জলে রাখিয়া দেন। ) যাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহারা সকলেই তাঁহাকে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং তাহাদের সহিত তিনি সমপর্যায়ে গল্প করেন, অন্তরঙ্গ অমায়িকতা লইয়া তাহাদের সহিত আলোচনা করেন, তাহাদিগকে পরামর্শ দেন—তাঁহার ওখানে শ্রীমতী কেলের আমাদের বান্ধবী মীরাকে ( মিস্ স্লেড ) দেখিয়াছেন, তাঁহার আচার-ব্যবহার গর্বিত ও উদ্ধত—শ্রীমতী কেলের বলিলেন—"এক রোমান গৃহকর্ত্রী।"

দুই মহান্ গুরু ও তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন উত্তরাধিকারী মঠাধ্যক্ষের ( প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ) স্মৃতি-জড়িত রামকৃষ্ণ-মঠ স্মৃতি ও প্রেমের মধ্য দিয়া সর্বোপরি তাঁহার মনে রেখাপাত করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ খুবই কম সন্তোষজনক মনে হইয়াছে। আবহাওয়া সাধারণ স্তরের এবং অনিশ্চিত। মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ অতিশয় বৃদ্ধ, অতিশয় শান্তশিষ্ট, অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন এবং এক জ্যোতিশ্চক্রে বলয়িত। তাঁহাকে যাহারা দেখে, তাহাদের নিকট তাঁহার উপস্থিতি এখনও রামকৃষ্ণের এক প্রতিবিম্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি আদৌ সক্রিয় নন, তিনি ধ্যান করেন, স্বপ্নের আবেশে হাসেন। অন্যান্যদের মধ্যে যাঁহার নেতা হইবার গুণ আছে মনে হয়, তিনি হইলেন ওঙ্কারানন্দ, তিনি তরুণ ( বয়স বছর ত্রিশ ), কর্মশক্তিময় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অশোকানন্দ—যাঁহার সহিত আমি বিশেষভাবে আমার বই লেখার কাজে সম্পর্কিত হইয়াছিলাম—এক বিচ্ছিন্ন মানুষ,

সম্প্রদায়ের সাধারণ মানসিকতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ; তাঁহার মেজাজটি সংগ্রামী, তিনি চাহিতেছেন বর্তমানের কর্ম ও চিন্তার সমস্যার সহিত সম্প্রদায়কে বেশি করিয়া জড়াইতে। তাহা ছাড়া, তাঁহার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বেলুড়ের পরিমণ্ডল স্থির ও আবদ্ধ, দুর্বহ, শ্বাসরোধকর। এই অবস্থার সহজাত সমস্ত দোষ আলস্য, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা সহ সম্প্রদায়-পরিচালনার গোঁড়া রীতিনীতির পথে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শ্রীমতী ভি. কেলেরের বর্ণনার মধ্য হইতে মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের বলিষ্ঠ ভঙ্গিটি ফুটিয়া উঠে। এই আদর্শচ্যুতিতে তিনি ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত ; এবং বিবেকানন্দের সহিত দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গতা তাঁহাকে যে অধিকার দিয়াছিল, তাঁহারই জোরে উচ্চে উঠিয়া তিনি সন্নাসীদিগকে কঠোর কথা বলিয়াছিলেন। প্রতিবেশী মুসলমানদের যাতায়াত ঠেকাইবার জন্য তাঁহারা বাগানের প্রাচীরে কাঁচভাঙা বসাইয়াছিলেন ; তাহাদের সহিত বিবাদ বাধিলে তাঁহারা পুলিস ডাকার কথা বলিলে মিস্ ম্যাকলেঅড চটিয়া গিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের মহান্ চিন্তার অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করিবার তিক্ততা সংগ্রহের জন্য এক কঠোর অবজ্ঞার সহিত তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা নম্রভাবে নীরব হইয়া ছিলেন ; তাঁহারা লজ্জা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ঢুকিয়াছে। গত বড়দিনের রীতি অনুযায়ী বাইবেল হইতে পাঠ হইয়াছিল ; এবং রামকৃষ্ণের ছবির পাশে ( নিচে ) শিশু যিশুকোলে ম্যাডোনার মূর্তি রাখা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীমতী ভি. কেলের শুনিতে পাইয়াছিলেন, অত্যাচারী ইউরোপীয়দের খ্রীষ্টের প্রতি সম্মানের বিরুদ্ধে তরুণ সন্ন্যাসীরা ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ জানাইতেছেন,—আর অন্যরা উহাকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এই বলিয়া আপত্তি জানাইতেছেন যে, খ্রীষ্ট এশিয়ার লোক ছিলেন।—মানবিক দুর্বলতা দীর্ঘকাল সুমহৎ মনকে অনুসরণ করিতে পারে না। সিঁড়ির নিচে গিয়াই আবার সে পড়িয়া যায়। চিরকাল—চিরকাল আবার তাহাকে তুলিয়া

ধরিবার কাজ শুরু করিতে হয়। সবচেয়ে মন্দ ব্যাপার হইতেছে এই যে, বাঁধাধরা কর্মসূচী ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কেবলমাত্র লিখিত কথাকেই মানা হয়। তাই ইহা অপরিহার্য যে, দুঃসাহসী প্রতিষ্ঠাতারা যাহা চান, তাহা যেন তাঁহারা লিখিয়া রাখিয়া যান।···সন্ন্যাসীরা বাগানের কাজে মন দেন, কারণ তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহা কী রকম হইবে, যেহেতু তাহার ব্যবস্থাপত্র নাই, তাঁহারা কেবল বাঁধাকপি ফলান। মিস্ ম্যাক্‌লেঅড তাঁহাদিগকে কিছু বীজ ও কলম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলিকে কাজে লাগাইবার সিদ্ধান্ত লওয়া সম্পর্কে ভয়ানক ঝক্কি লইতে হইয়াছিল। পশ্চিম সম্পর্কে এক বিপুল অজ্ঞতা আছে। সেজন্য দোষ ইংলণ্ডের যেমন, ভারতবর্ষেরও তেমনি। যাহা ইংলণ্ডের নয়, ইউরোপের, এমন কোন কিছুর সঙ্গেই ভারতবর্ষের পরিচয় নাই। জার্মানি বা ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় বা শিল্পী জীবনের কিছুরই সহিত পরিচয় নাই, গথিক গির্জা সম্পর্কে কিছুই জানা নাই। আমার বইগুলি তাঁহাদের কাছে পরিচয়ের এক সঞ্চিত সম্পদ হইয়া থাকিবে। কারণ, অন্ততঃপক্ষে পড়িলেও তাঁহারা গর্ববোধ করিবেন, ইহার মধ্যেই তাঁহারা গর্ববোধ করিতেছেন। ( জীবিত বড় বড় শিষ্যরা ইহাতে গভীরভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। মিস্ ম্যাক্‌লেঅডকে ভগিনী ক্রিস্টিন মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে কয়েক লাইন লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। তিনি এই প্রথম আমার 'রামকৃষ্ণের জীবন', পড়িতে পাইয়াছেন এবং তাহা তাঁহার মনের মতোই হইয়াছে। )

এই বাঁধাধরা কর্মসূচীর মধ্যেও অবশ্য আছে ধর্মীয় কাব্যের মণিমুক্তা—গড়িয়া-উঠা আস্ত একটা উজ্জ্বল সন্ত-জীবনকথা—তাহার নায়ক শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নন্, বড় বড় শিষ্য ও মঠাধ্যক্ষরাও, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু কেহই এইসব ফুলকে কুড়াইয়া রাখার কথা ভাবে না। শ্রীমতী ভি. কেলের আমার জন্য যে কয়েকটি টুকরো-টাকরা আনিয়াছেন, সেগুলি এইরকম :

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে এক তরুণ আমেরিকান বেলুড়ে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিল। বিশ্বাসে ও প্রেমে সে উচ্ছলিত ছিল। কলিকাতা পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সে জুতা খুলিয়া ফেলিল এবং হাতে একটা লম্বা নারিকেলের পাতাসুদ্ধ বাগুলা লইয়া গান গাহিতে গাহিতে খালি পায়ে চলিল। যখন সে মঠের দরজায় আসিয়া ধাক্কা দিল, তখন ব্রহ্মানন্দ শশব্যস্ত হইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তরুণ আগন্তুককে দেখিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত সন্ন্যাসীরা তাঁহার আগমনের কথা জানাইতে চাহিলেন। ব্রহ্মানন্দ দরজা খুলিতে অস্বীকার করিলেন। বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহা হইলে তিনি কি অন্য সময়ের কথা বুঝাইতে চাহিতেছেন?—"সন্ধ্যাবেলায়?" "—না।" —"কালকে?" —"না।" শিবানন্দের শরণ লওয়া হইল। তিনি তরুণটির হইয়া ওকালতি করিতে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই ব্রহ্মানন্দ, এ কী করছ? যারাই আসে, তাদের সকলের সঙ্গে তুমি দেখা করো, আর এই বেচারা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ না? এত দূর থেকে ও এসেছে, তাতেই ওর আনন্দ, ৮ দিনের বেশি ও থাকতে পারবে না। দরজা খোলো, আমি অনুরোধ করছি।" —"না।" —"তোমার অসুখ করেছে? ওর বিরুদ্ধে তোমার কিছু আছে?" —কোন উত্তর নাই। —"তুমি কি অন্য দিন দেখা করতে চাও?" —"কোন দিনই না।" মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শিবানন্দ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।…আগন্তুকের এই আশাভঙ্গ ভুলাইবার চেষ্টা চলিল। দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত নৌকায় করিয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল, যাহাতে রামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তাঁহাকে দেখানো যায়। ইতিমধ্যে নৌকা যখন গঙ্গার বুকে বেলুড় মঠের চত্বরের সামনাসামনি আসিল, ব্রহ্মানন্দ চত্বরের দিকে তাঁহার ঘরের দরজাটা খুলিলেন এবং চত্বর হইতে দূরবর্তী তরুণটিকে আশীর্বাদ করিলেন। তরুণটি নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। মুহূর্তেই তরুণটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।—সকলে ভাবিল,

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। সকলে কাছে আসিল। সে জ্ঞান হারাইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে তাহার অনেক সেবাযত্ন করা হইল। একটুও সুস্থ হইল না। তাহাকে জাহাজে করিয়াই আবার আমেরিকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সেখানে পৌছিযাই সে মারা গেল। তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন: "ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য যারা পীড়াপীড়ি করেছিল, তারা সব অন্ধ। আমি কি জানতাম না? আমি চেয়েছিলাম, ও যেন অন্ততঃ স্বদেশে ফিরে গিয়ে মরে। যদি আমি দেখা করতাম, সঙ্গে সঙ্গেই ও মারা যেত। ও ছিল এত শুদ্ধ, এত পবিত্র, জীবন থেকে এরই মধ্যে এমন শিথিল-বন্ধন! ও জীবনের সঙ্গে বাঁধা ছিল শুধু একটা মাত্র সুতোয়।"

—আর একটি কাহিনী, অন্য সুরের। তাহা মনে করাইয়া দেয় সেই ফ্রাঁসোয়ার কোন কোন রসিক সঙ্গীকে: মঠের এক তরুণ ভারতীয় ব্রহ্মচারীর মনে বেশ কিছুটা সংশয় ছিল। সে তাহার বিশ্বাস এবং সন্ন্যাসীদের শক্তির পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। সে বলিতে শুনিয়াছিল, সাধু লোকের সান্নিধ্যে কাহারও কুচিন্তা থাকিতে পারে না। সে ঠিক করিয়াছিল, আহারের পরে সন্ন্যাসীদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া সে একমনে অশ্লীল চিন্তা করিবে। তাহাই সে করিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন গা-বমি-বমি করিতে লাগিল যে, কুচিন্তা করা সে পরদিনের জন্য স্থগিত রাখিল; ভাবিল, গরমে তামাসায় মন বসিতেছে না। পরদিনও সে বিশেষ সফল হইল না, তাহার চিন্তার সূত্র ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অবশেষে তৃতীয় প্রচেষ্টার পর সে তাহা ছাড়িয়া দিল এবং একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল।—খাওয়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া বলিলেন: "সমবেত এই সৎ মানুষগুলিকে উত্ত্যক্ত করিতে তোমার লজ্জা করে না? যখন এইরূপ তামাসা করিবার ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে চাহিবে, তখন আমার কাছে চলিয়া আসিও।"

—অমুক অমুক মহারাজের তাঁহাদের প্রতি কতো ভালোবাসা—একথা সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে আলোচনা করেন যে, তাহাতে শ্রীমতী ভি. কেলের বিস্মিত হইয়াছেন; তাঁহারা কখনও বলেন না: "আমরা এত ভালোবাসি।" তাঁহারা বলেন: "আহা! উনি আমাকে কত ভালোবাসেন!" বিদায় লইবার সময় তাঁহাদের একজন, তিনি যে স্নেহ দেখাইয়া গেলেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন। শ্রীমতী কেলের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "কেন বলুন তো আপনারা কখনও বলেন না যে আপনারা ভালোবাসেন, কেবল বলেন, আপনাদিগকে কে কত ভালোবাসেন?" মধুর নম্রতার সহিত এক তরুণ সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন: "আমরা ভালোবাসবার কে? আমরা কিছুই নই। ভালোবাসা কেবল আমাদের জ্যেষ্ঠদেরই শোভা পায়।"

শ্রীমতী কেলের ইউরোপে রচনাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশ অনুমোদনের ভার পাইয়াছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি আমার সহিত আলোচনা করিলেন।—ইতিমধ্যেই তাঁহার বান্ধবী শ্রীমতী ভি. পেলেট 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' জার্মান ভাষায় প্রকাশ করিতে চলিয়াছেন।

···গান্ধীর আশ্রমে শ্রীমতী ভি. কেলেরের লক্ষ্য-করা একটি ঘটনা: যাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে তাহাদের সকলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার পর,—( সেইসব কথাবার্তায় গান্ধী মনের এক যথাযথ ও প্রীতিপূর্ণ সজীবতা দেখাইয়াছেন, )—হঠাৎ তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন: আর সকলে আত্মস্থ হইয়া তাঁহার চারিপাশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। একমাত্র শ্রীমতী ভি. কেলের লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গান্ধীর মনঃসংযোগ সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটিয়াছিল এবং বুঝিতে পারা যাইতেছিল, তাহা চরম মনঃসংযোগ: সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তারপর সেই অবস্থা হইতে তিনি বাহির হইলেন এবং কথাবার্তা শুরু করিলেন। কিন্তু শ্রীমতী কেলের তাঁহার চেহারার

পরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া রামকৃষ্ণের সমাধি সম্পর্কে আমার লেখাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ; তিনি গান্ধীর বুকের দিকে তাকাইলেন : বুকটা লাল ; যেমন রামকৃষ্ণের দেখার বর্ণনায় আছে। এই দিয়াই 'রামকৃষ্ণ' চিনিয়াছিলেন ( যেমন রবীন্দ্রনাথের পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারে ) সমাধির আসা-যাওয়া, ঈশ্বরের সান্নিধ্য। যৌগিক মনঃসংযোগে হঠাৎ এইরকম রক্ত জমিয়া উঠে।—আর তাহা হইলে বলা চলে যে, গান্ধীরও নিজের 'যোগ' আছে।

২০শে জুন, ১৯৩০ এবং পরের দিনগুলি ॥

—কয়েকদিনের জন্য কাতামায়া এবং কালিদাস নাগ আসিয়াছেন—উভয়েই আসিয়াছেন নিজ নিজ দিক হইতে, কালিদাস নাগ আসিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে; বোম্বাই হইতে ভেনিসে আসিয়াছেন ; এবং তাঁহাকে একবছর ইউরোপে ও আমেরিকায় কাটাইতে হইবে ; তিনি বক্তৃতা দিতে চলিয়াছেন ইংলণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে, হল্যাণ্ডে, জার্মানিতে, সুইজারল্যাণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে··· ।

···কালিদাস নাগ আগ্রহে ভরপুর। সাত বৎসর হইল আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছে। তারপর হইতে তিনি ভারতবর্ষে প্রচুর কাজকর্ম করিয়াছেন, দূর প্রাচ্যে সফর করিয়াছেন। তিনি বদলাইয়া গিয়াছেন, স্বাভাবিকভাবেই বয়স বাড়িয়াছে ; ঈষৎ মোটা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের তারুণ্য অক্ষুণ্ণ আছে ; তিনি বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।—তিনি আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে, কয়েকদিন ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে চাহিতেছেন ; কারণ, ব্যাপারটা এই যে, ভারতবর্ষে আমার বই ও চিন্তার মাধ্যমে আমি বেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছি; এবং নাগ হইয়া উঠিয়াছেন আমার প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবীদের জগতে আমার সহকারী।—তাই আমার চিন্তার অনেক বোঝা তাঁহার কাছে নামাইয়া দিই।—তিনি সর্বদাই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে

আমার সাম্প্রতিক বইগুলি সঙ্গে রাখেন, তাহাতেই তিনি খোরাক পান এবং শোনা যায়, উহা ভারতবর্ষে একপ্রকার 'সুসমাচার' হইয়া উঠিয়াছে।

—নাগ বলিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে শ্রীমতী ভি. কেলেরের ধারণাই ঠিক। দুঃখের বিষয়, উহা কার্যতঃ মঠধারীর মানসিকতার অতি সাধারণ স্তরে গিয়া পড়িয়াছে। মিশন অত্যন্ত মামুলি ভাবে 'পাকা ফলের' মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, তাহারা তাহাদের অজ্ঞতাকে অন্ধের মতো আক্ষরিক ভাবে এক সীমাবদ্ধ ধার্মিকতা দিয়া পোষাইয়া লইতে চায়। অশোকানন্দ ইহার ব্যতিক্রম, যদিও তিনি তত্ত্বদর্শনের দিকে ঝুঁকিয়াছেন—আর স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে সর্বশেষ জীবিত ও বৃদ্ধ প্রশান্ত শিবানন্দও তাহাই করিতেছেন, তিনি অতীতের স্বপ্নে মুগ্ধ আছেন। তাহা ছাড়া, ইহা লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর হইতে যঁ'হারা নেতৃত্বে আসিয়াছেন, সেই সব বড় বড় মহারাজরা, রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যরা, আবার ঔদাসীন্যভরে তুরীয়ানন্দের ধ্যানের মধ্যে ঢুলিয়া পড়িয়াছেন, অথচ দেশের সেবার জন্য বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে উহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত দূরে সরিয়া গিয়াছেন, সম্প্রদায়ের আচার-আচরণকে নৈরাজ্যের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।—জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে যেন বুঝিতে পারা যায় যে, আজ বাহির হইতে সবচেয়ে প্রবল যে প্রভাব ইহাতে পড়িয়াছে, তাহা হইতেছে গান্ধীর প্রভাব।

জুলাই, ১৯৩০ ॥

—ফাদার অ্যাঁরি ব্রেম-র মতামত আমার নিকট মূল্যবান্ (কারণ, তিনি ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক, এবং তাঁহার গবেষণা আমি কাজে লাগাইয়াছি); অবশেষে তিনি আমার

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তিন খণ্ড বইয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ( ৫ই জুলাই )। আমার বান্ধবী ও খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমার "অভিভাবিকা" জে. এম. তাঁহাকে জানেন; মনে হইতেছে, বিলম্বে প্রাপ্ত এই আনন্দদায়ক পত্রখানির ব্যাপারে তিনি কিছু করিয়া থাকিবেন; পত্রখানিতে ব্রেম্ঁ বলিয়াছেন, তিনি এই বইগুলি পড়িতে পড়িতে যতই অগ্রসর হইতেছেন, "এগুলি যে পরিপ্রেক্ষিত উদ্ঘাটিত করিতেছে এবং যে চিরন্তন সাদৃশ্যবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে—তাহাতে তিনি ততই আনন্দে অভিভূত হইতেছেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "আমার নিজের পড়াশুনার কাজে এগুলি বিরাট সহায়ক হইবে।"—প্রকৃতপক্ষে, এগুলি যদি কাজে লাগে এবং এইভাবে ক্যাথলিক জগতে ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের জ্ঞান ও মর্যাদার প্রবেশ ঘটাইতে পারে, তাহা হইলে আমার সময় বৃথাই নষ্ট হইবে না। ইহা হইবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পারস্পরিক আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ।

আগস্ট, ১৯৩০ ॥

—ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলিকে আমার 'য়ুরোপের' বন্ধুদের চেয়ে এত কম আর কেহ বুঝেন নাই। ইহা তাঁহাদের মনের ঠিকানা জানে না। তাহা ছাড়া আমার 'বীঠোফেন'-ও তাই। আমার চিন্তার ব্যাপারে পুরোপুরি নির্বিকার থাকেন এমন একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে আমি দিন কাটাইলাম ও কাজ করিয়া গেলাম,—তাহা ভবিষ্যতে এক বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। ( কিন্তু ফ্রান্সে আমার সম্পর্কে সকল কিছুতেই সকলের চোখকান বোজা; কোথাও আমার যাইবার স্থান নাই। )

কিন্তু, অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলি সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিধ্বনিও জাগাইতেছে। যাহারা এগুলির কবলে পড়িতে পারে বলিয়া একেবারে মনে হয় না, তেমন লোককেও

এগুলি নাড়া দিয়াছে। তাই একখানি চিঠি আসিয়াছে…ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রী – র নিকট হইতে ( ১৯শে আগস্ট )। এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিটি আমাকে লিখিয়াছেন : তাঁহার মনে হইতেছে, এ পর্যন্ত যে-অন্ধকারে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি আলো দেখিতে পাইতেছেন। তিনি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, আমি যেন তাঁহাকে পথ দেখাই।

আগস্ট, ১৯৩০।

—ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ দিন পনেরর জন্য জেনেভায় আসিয়াছেন ; খবর দিয়াছেন, আমাদের সহিত দেখা করিতে চান। আমি ও আমার বোন জেনেভায় আসিলাম ( ২৮ আগস্ট )। গ্রীষ্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহ ঝড়বৃষ্টির পর এখন আকাশ পরিষ্কার এবং গুমট আবহাওয়া ; অর্ধেক ইউরোপে লোকে গরমে সিদ্ধ হইতেছে।—আমরা মিস্ গেভ্‌সের ওখানে প্রাতরাশ সারিয়া লইলাম। * * * তারপর চলিয়া গেলাম রবীন্দ্রনাথের ওখানে, সেখানে দু ঘণ্টা রহিলাম। জেনেভার একটু বাহিরে তাঁহার জন্য এক উচ্চভূমিতে সুন্দর একখানি বাড়ি ভাড়া লওয়া হইয়াছে। বাড়িটা একটা বিরাট বাগানের মধ্যে, সেখানে গ্রীষ্মাঞ্চলের এক বিশাল বাঁশঝাড় গজাইয়া উঠিয়াছে। তিনি সেখানে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিজস্ব পরিবেশেই আছেন। আর তাহাতে তিনি নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছেন। প্রথম দর্শনে মনে হইল, তিনি একটু রোগা হইয়াছেন, বৃদ্ধদের যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে। সেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাব আর নাই ; পোশাকের নিচে দেহটা শীর্ণ মনে হইল, কিন্তু মুখটি ভরাট ও রাঙা ; আমাদের সহিত আলাপ শুরু করিবার পর হইতেই বন্ধুজনের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবার আনন্দে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিলেন। নূতন করিয়া তারুণ্য ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার উচ্চগ্রামে বাঁধা চিরকালের সেই কণ্ঠস্বর খুবই মিহি হইয়া গিয়াছে ; বলা চলে, স্বরটা 'খাদে বাঁধা' ; অনন্ত-

পিতার মতো তাঁহার এই শুভ্র শির এবং পয়গম্বরের মতো শুভ্র শ্মশ্রুর সহিত এই কণ্ঠস্বর অদ্ভুত এক বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। * * *

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার বইয়ের কোন কোন অংশ পড়িবার পর (তিনি না বলিলেও তাহা সুস্পষ্ট) তাঁহার মনে যাহা জাগিয়াছে, তাহার অবারিত প্রকাশ দিয়াই শুরু করিলেন। রামমোহন রায় ও তাঁহার বাবার কথা, তাঁহাদের ধর্ম-সমন্বয়ের—(কিন্তু সেই একই সময়ে তাঁহাদের ঘোষিত একেশ্বরবাদের)—প্রচেষ্টার কথা বলিতে গিয়া তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাহা সহিষ্ণু ছিল না; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও যোগ করিলেন যে (এবং তাহা ছিল আমার সমালোচনার প্রচ্ছন্ন উত্তর), কোন কোন স্থলে সত্যকে অসহিষ্ণু হইতেই হয়; কোন কোন বিভ্রান্তিকে ও চিত্ত কলুষিত করে এমন কোন কোন নির্বুদ্ধিতাকে সহ্য করা চলে না। সেখান হইতে তিনি চলিয়া আসিলেন হিন্দু অনেকেশ্বরবাদের, এবং বিশেষতঃ কালী-উপাসনার, বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে। সে সম্পর্কে তিনি আবেগ-দীপ্ত ঘৃণার তীব্রতা লইয়া বলিয়া গেলেন (তাঁহার মধ্যে এমনটি আমি আর কখনও দেখি নাই)। অতিশয় ভাবপ্রবণ মানসিক গতিশক্তি-সম্পন্ন এই মানুষটির নিকট শৈশবের কোন রেখাপাত সমগ্র জীবনের চিন্তাকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যখন বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার শৈশবের সেই শিহরণ অনুভব করিতেছিলাম; তিনি বলিতেছিলেন সেই দিনটির কথা, যেদিন কলিকাতার বড়ো কালী-মন্দিরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, রক্তের স্রোত চৌকাঠের নিচে উপচাইয়া পড়িয়াছে এবং পথচলতি একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক নিচু হইয়া রক্তে আঙুল ডুবাইয়া লইয়া তাহার শিশুর কপালে তিলক আঁকিয়া দিতেছে। সেই একই রকম ভাবে ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বলিলেন, এক হতভাগা পুরোহিত একটা ছাগল-বাচ্চার পা মুচড়াইয়া ধরিয়া গলায় কোপ বসাইবার আগে তাহাকে ঝাঁকুনি দিতেছে। তিনি আরও

উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, এই ধরনের রক্তাক্ত নিম্নস্তর হইতেই চিরকাল মানুষের মধ্যে খুনীর হিংস্রতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেশের ভজনা ও রুধিরপানের রুচি প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি ইহাকে অধিবিদ্যা বা প্রতীকের স্তরে লইয়া গিয়াও ইহার সহিত কোন আপস তিনি স্বীকার করেন না। (স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁহার চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ।) তিনি এমন কথা পর্যন্ত বলিলেন যে, যাহারা কালীর উপাসনা টিকাইয়া রাখে. তাহারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হইতেই পারে না। এই ভয়ংকরী দেবীকে তিনি ধ্বংস করিতে চাহিলেন,—(এই ভয়ংকরী মাতা সম্পর্কে নিবেদিতাকে বলা বিবেকানন্দের বিস্ময়কর উক্তিগুলি আবার নূতন করিয়া পড়া যাক!) তাঁহার দেশের লোকের বিরুদ্ধে,—যে স্তূপীকৃত কুসংস্কার তাহাদিগকে পিষ্ট করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যকে, স্বাস্থ্যপ্রদ নাস্তিক্যকে, আহ্বান জানাইলেন; মনের এইসব দানবকে ঝাঁটাইয়া দূর করিবার জন্য, যুগযুগান্তরের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করিবার জন্য, সাময়িকভাবে উহাই তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের বাহিরে ব্যতিক্রম হিসাবেও তিনি অধিবিদ্যার মহৎ চিন্তাকে সহ্য করিতে পারেন না। তিনি পাশ্চাত্যের সেইসব মানুষের মতোই কথা বলিলেন, যাহারা ব্যবহারিক স্তরেই নিজেদিগকে সীমাবদ্ধ রাখে, যাহারা সামাজিক ও সর্বজনীন মঙ্গলের ক্ষেত্রে খাঁটি দর্শনকে, এমন কি খাঁটি ধর্মকে, ফলপ্রসূরূপ কার্যকর বলিয়া মনে করে না। তিনি একমাত্র এই মূল্যেই মানুষের ঐক্যকে গ্রহণ করেন।

স্বভাবতই আমি কোন তর্ক করিবার চেষ্টা করিলাম না, তাঁহাকে বলিতে দেওয়াই ছিল বড় কথা। আমি শুধু সংক্ষেপে পাশ্চাত্যের এক শিশু খ্রীষ্টানের (আমার নিজের) বাইবেল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া—এবং বিরূপতা জানাইয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম। সেই প্রতিক্রিয়া ও

বিরূপতা আমি পোষণ করিতেছি বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে—আবেলের রক্তাক্ত বলিদানের প্রতি জেহোবার পক্ষপাত প্রকাশ করার জন্য এবং ক্ষেতের ফসল তাঁহাকে নিবেদন না করায় কেইনকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য। এই দৃষ্টান্ত দিয়া আমি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলাম যে, ভারতবর্ষে কালীর নামে যাহা কলংকিত, তাহারই মতো একই রক্তাক্ত উৎস সেরা একেশ্বরবাদী ধর্মগুলিরও। আমি আরও বলিলাম্ যে, সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে গভীর সহজাত বৃত্তিগুলিকে (উৎপাটিত করিবার পরিবর্তে) উধ্ব'ায়িত করা; আর ইহাই দেখিতে বড়ই হৃদয়গ্রাহী যে, যাহা এই প্রাচীন বাইবেল বা বলির পশুর মেদ-ধূমে ধূমায়িত, তাহাই এই সুসমাচারের শ্রেষ্ঠ কুসুম! ঈশ্বরের দেবশিশু নিষ্পাপ বলিপ্রদত্ত খ্রীষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। (আমি নিশ্চিত যে, ইহার অনপেক্ষিত হৃদয়গ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথের মনে অক্ষুন্ন থাকিবে।)

* * *

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইয়ের প্রথম খণ্ড 'রামকৃষ্ণের জীবন' (দি লাইফ্ অব্ রামকৃষ্ণ) রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যার্থে অদ্বৈত আশ্রমের সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (আগস্ট)।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

ইউরোপে বক্তৃতার একটা বিরাট সফর সারিয়া কালিদাস নাগ ফিরিয়া আসিলেন। * * * —বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় তিনি আমার বইগুলির কথা বলিয়াছেন; সেখানকার তরুণদের বিষণ্ণ ও ট্র্যাজিক গাম্ভীর্যে তিনি অভিভূত হইয়াছেন। লোকে বলে, বুলগেরিয়া কয়েক শতাব্দী যাবৎ হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার বর্তমানও তাহার অতীতের মতোই বিষাদময়। আর এই কারণেই ধর্মীয় ও অধিবিদ্যাগত চিন্তার প্রতি তাহার এতই আকর্ষণ। প্যারিসে সিলভ্যাঁ লেভি তাঁহার (কালিদাস নাগের) সামনে (আরও একবার)

আমার সম্পর্কে বিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমার 'গান্ধী'র পর আমার 'বিবেকানন্দ'-র জন্য তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না। তাহা ছাড়া, তিনি বিবেকানন্দকে ঘৃণা করেন, যেমন ঘৃণা করেন আমাকে। তিনি বলিয়াছেন: "ওই দুই বাক্যবাগীশ · " —তাঁহার নিকট ভারতবর্ষও কিন্তু পুঁথিপত্রের বস্তু হইয়া থাকিবে। নবজীবন-লাভ নিষিদ্ধ! —কিন্তু তাঁহার অনুমতি ছাড়াই তাহা সে লাভ করিবে। ···এই শ্রেণীর ইহুদীরা এশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদিগকে পশ্চিমের প্রতিনিধি রূপে জাহির করিতে গিয়া হাসির খোরাক জোগায়! নিজেরা যে কতখানি বিদ্রূপের পাত্র হইয়া উঠে, সে বোধও ( যদি কখনও বোধ বলিয়া কিছু থাকিয়া থাকে ) তাহারা হারাইয়াছে। অন্য পক্ষে, নাগ ভারতবিদ্যাবিশারদ মাসঁমুর্সেল ও চীনবিদ্যাবিশারদ পোলিওর কথা সহানুভূতির সহিত বলিলেন। * * *

জুন, ১৯৩১

গত বৎসর আমার 'রামকৃষ্ণ' পড়িয়া ক্রুসেল্‌সের এক নার্স তাঁহার আবেগের কথা আমাকে লিখিয়াছিলেন, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ( ৩১শে মে ), তাঁহার জীবনে যে স্বপ্নকে তিনি অপূর্ণ মনে করিয়াছিলেন, আমার মধ্যস্থতার কৃপায় তাহা সার্থক হইয়াছে। ···"আমি সেই পথ পাইয়াছি যাহা আমাকে তন্ত্রের পথে মায়ের কাছে লইয়া গিয়াছে; এই দীক্ষা আমি পাইয়াছি স্বয়ং শিবানন্দের নিকট হইতে। আমি যে সমাজের জন্য এত কাঁদিয়াছি, এইভাবেই আমি তাহা পাইয়াছি। ইহার ফলে আমার আদর্শ ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে আমার সকল সংশয়ের নিরসন হইয়াছে; অসংখ্য পথ ধরিয়া ঈশ্বরে উপনীত হওয়া যায়। একমাত্র ঈশ্বরই যদিও কাম্য, তবু তাঁহাকে লাভ করিতে নিজের পথই অনুসরণ করিতে হয়। ইহাই ছিল আমার পথ। ইহার বাহিরে

আমি কিছু করিতে পারিতাম না। প্রতিদিন নিজেকে আমি অধিকতর শক্তিমতী মনে করিতেছি। শুধু একমাত্র এখনই আমি জীবিত আছি। স্বাধীন হইবার পথে ইহা কোন বাধা সৃষ্টি করে না। আমি জানি, উপায়গুলি কিছুই নহে, সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে কাজে লাগাইতে হয়। আমি যে অন্তরে অবশেষে আনন্দ ও শান্তি খুঁজিয়া পাইয়াছি, আমার সেই অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

(এইভাবে আমি গান্ধী ও রামকৃষ্ণকে উৎসাহিনী শিষ্যাদের দিয়াছি।)

আগস্ট, ১৯৩১॥

জে. ই. গুজ্ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের এক চিত্তস্পর্শী পত্র (২৫ আগস্ট) আসিয়াছে; তিনি বেডফোর্ডশায়ার, কেম্‌ব্রিজ-শায়ার, হার্টফোর্ডশায়ার, হান্টিংডনশায়ার ও নরফোকের জন্য 'লীগ অব্ নেশন্‌স্'-এর ভ্রাম্যমাণ সচিব। তিনি সেইসব ইংরেজদের একজন, যাঁহারা তাঁহাদের ভুল স্বীকার করিতে কখনও দ্বিধা করেন না,- সে ভুল যদি সমগ্র জীবনের ভুলও হয়। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলি সদ্য পড়িয়াছেন এবং তাহাতে গভীরভাবে অভিভূত হইয়াছেন। কারণ, তিনি ১৮৯৩ হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন.; তিনি যুক্তপ্রদেশে কাজ করিয়াছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর সেই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। আমি যে যুগটির বর্ণনা দিয়াছি, সেই পুরা যুগটির মধ্যে তিনি ছিলেন, কিন্তু, তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ছিলেন 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে'; এবং আজ তাঁহার দুঃখ ও লজ্জা হইতেছে যে, এই মহান্ ঘটনাবলী ও মহান্ মানুষদের পাশেই তিনি থাকিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেন নাই। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেরভিয়ের দম্পতির সহিত জরিপ বিভাগের

কর্মচারী রূপে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল এবং মায়াবতীতে (মাইপৎ) আশ্রমের জন্য জমি দখলের নিয়মমাফিক ব্যাপারে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মায়াবতীতেও তিনি সেরভিয়ের দম্পতি এবং তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়াছেন। এক বৎসরের জন্য 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর গ্রাহক হইয়াছিলেন ( এবং এখন আবার নূতন করিয়া গ্রাহক হইতে যাইতেছেন )। আলমোড়ায় তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দের ( তিনি বলেন, আর্‌ভিন্দ্‌ ) মতো একই সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একই বাহিনীতে ছিলেন। অরবিন্দ আসিয়াছিলেন কেম্ব্রিজ হইতে। গুজ্‌ আসিয়াছিলেন অক্সফোর্ড হইতে; কিন্তু তাঁহারা যোগাযোগের চেষ্টা করেন নাই। একথা মনে করিতে তাঁহাদের লজ্জা হয় যে, অরবিন্দ ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল করিয়াছিলেন; পরীক্ষাটা বেশ কঠিন ছিল ( রেকাব ছাড়াই ঘোড়ায় উঠিতে হইত ); এবং ব্যর্থতার ফলেই সম্ভবত ইংরেজের সেবায় বিমুখ হইয়া তাঁহার জীবনের ক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়াছিল।

**আগস্ট, ১৯৩২ ॥**

এক অতি বিস্ময়কর পত্র। যুগের নৈতিক দলিলরূপে ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেই হইবে।...যিনি লিখিয়াছেন, তিনি শুধু নামের আদ্যক্ষরগুলি দিয়াছেন ( কিংবা উহা 'Deo Soli Gloria' এই ল্যাটিন কথাগুলির আদ্যক্ষরই হইবে ); তিনি এক বৎসর পূর্বে আমাকে একটি অদ্ভুত চিঠি লিখিয়াছিলেন। যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে, তিনি ছিলেন বেলজিয়ামের এক নার্স; ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলি তিনি পড়িয়াছিলেন; শুধুমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত সহমর্মিতা নয়, ঐকান্তিক অনুরাগ লইয়াই তিনি আমাকে তাঁহার মনের কথা বলিয়াছিলেন; মনে হইয়াছিল, তাঁহার মন বুঝি অনেকদিন ধরিয়া পথ হাতড়াইতেছিল; তিনি প্রধানতঃ তান্ত্রিক যোগের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছিলেন এবং তাঁহার চিন্তা এমনই আন্তরিক ছিল যে,

তাহাতে দ্ব্যর্থকতাপূর্ণ কোনও ব্যাখ্যার স্থান ছিল না ; মনে হইতেছে, ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং অমিও তাহাই ঘটাইয়া দিয়াছিলাম। · তাহার পর তিনি চুপচাপ ছিলেন। তিনি আমাকে ২০শে আগস্ট নাগাদ লিখিয়াছেন :

" · এক বছরের কিছু আগে, সম্ভবতঃ আমার পূর্ব ইতিহাসের কিছু ব্যাপার আমাকে মহাদেবীর মন্ত্রে দীক্ষিতা এবং স্বামী শিবানন্দের শিষ্যা হইবার অদ্ভুত ভবিতব্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে ; আপনারই অনুরোধে আমি তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার চিঠিটা খুব খারাপভাবে লেখা হইয়াছিল, কারণ, আমি দৈহিক ও মানসিক এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। তিন মাসের অসুস্থতার পর তাহার জের মিটিয়াছিল। সেই চিঠির শেষে আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম : 'আমার সম্মুখে এখন সকল কিছু করিবার রহিল।' তখন আমি দেখিতে পাই নাই যে, আমার শান্তি এত কাছে, আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে এবং যাহা আমার একমাত্র কাম্য —সত্তার সহিত মিলন—তাহা কোন্ রূপের মধ্যে উপলব্ধি করিব।— এবং সেই মিলনে উপনীত হইবার জন্য ও আমার পথ বাছিয়া লইবার জন্য, সর্বাগ্রে আমার প্রয়োজন হইয়াছিল,— রুচি, অরুচি, ছোটো খাটো সমস্ত খেয়াল-খুশি, যাহা আমার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে প্রকৃত বস্তু হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে আমার 'আমি'র প্রতিরোধকে জয় করার। আর সেইজন্যই অন্তরের নিয়মানুবর্তিতার কর্মে পরিপূর্ণরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আমার দীক্ষাগ্রহণের প্রথম বৎসরটি ছিল এক ভয়ংকর সংগ্রামের কাল, তাহা আমাকে দৈহিকভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, কিন্তু আমাকে জয় আনিয়া দিয়াছিল।·· আমার আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছিল, আমার ও আমার বাস্তব সত্তার মধ্যেকার বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছিল।—তখন আমার বৃত্তির স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। ইহাই দেখিয়াছিলাম যে ; দশ বৎসরেরও

অধিক কালব্যাপী আমার সকল অভিজ্ঞতা, আমার ধ্যান, আমার অনুসন্ধান, আমার সংগ্রাম আমাকে আমার বিশ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী বিশ্বাসে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।—ইহা সেই বিশ্বাস, যাহাকে আমি তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত সমস্ত কিছুর সম্মুখে সন্দেহ করিয়াছি, কিন্তু পুরাপুরি পরিত্যাগ করি নাই; সেই বিশ্বাসটি হইতেছে—'কমিউনিজ্‌ম্‌'।

কমিউনিজমের মধ্যে আমি কেবল 'ধর্মকে', আমাদের যুগের নিয়মকে দেখি নাই,—দেখিয়াছি বিশ্বজনীন শৃঙ্খলার সম্পূর্ণীকরণকে, ঐক্যের উপলব্ধির একমাত্র ভিত্তিকে, এবং সর্বোপরি ইহার মধ্যে আমি দেখিয়াছি মহাজাগতিক শক্তির ধ্বংস ও সৃষ্টির দ্বৈতরূপের বিপুল প্রকাশকে। আমি মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম: হিন্দু গোঁড়ামি হইতে মার্কসীয় গোঁড়ামিতে ঝাঁপ দেওয়া একটা মস্ত ঝাঁপ। —কিন্তু তাহা কি ভিন্ন রূপে অনন্য সত্তার একই অনুসন্ধান ও একই স্বীকৃতি নয়? জগতে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে সত্তার প্রয়োজনে লাগার জন্য সত্তার ক্ষয়িষ্ণু রূপগুলিকে কি বর্জন করিব না?—আর ইহা যতই অদ্ভুত মনে হউক না কেন, আমি এইভাবেই কমিউনিজমের মধ্যে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ ও উপলব্ধিকে খুঁজিয়া পাইয়াছি। আর এই একইভাবে আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি শান্তি ও আনন্দ,—সত্তার সহিত সংযোগের,—বিশ্বজনীন জীবনে আমার 'আমি'-কে একান্বিত করিবার বিপুল আনন্দ। এখন আমার সকল সংশয়, আমার সকল উদ্বেগ, চিরকালের জন্য দূর হইয়াছে। আমার জীবনের, আমার 'আমি'-র, কোনও গুরুত্বই নাই। আমি সর্বহারা বিপ্লবের সেই বিশাল আন্দোলনের একটি অণুমাত্র, যে বিশাল আন্দোলনের নেতৃত্বে রহিয়াছে লেনিনের পার্টি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমার বর্তমান বিবর্তনে আমাকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মনন বা ভক্তির ধ্যানের ব্যক্তিগত সুখ হইতে—নিজের জন্য সমস্ত অনুসন্ধান হইতে—তিনিই

আমাকে ঘুরাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে আমি জগতের স্থূল সমস্যাগুলির মুখামুখি দাঁড়াইতে পারি। তিনিই আমাকে দেখাইয়াছেন, জনগণের সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, একমাত্র ভক্তি যাহার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে। আর এইভাবেই তিনি আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন অন্য একজনের কাছে, যাঁহাকে এই জীবনে গুরু বলিয়া মানিতে পারি,—যিনি 'আমাদের মহান্ নেতা'—যাঁহার নাম স্তালিন।

আপনি নিশ্চয় মনে মনে ভাবিতেছেন, আমার সেই ধর্মীয় প্রত্যয়গুলির কি হইল? সেখানেও আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, এবং আমি শুধু তাঁহার শিক্ষাকেই অনুসরণ করিয়াছি। অভিজ্ঞতাজাত না হইলে কোন কিছুই বিশ্বাস করা উচিত নয়—এই কথাই কি তিনি নিরন্তর বলেন নাই? যতদিন ধর্মীয় শিক্ষা মনুষ্য জনসাধারণের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয়, ততদিন কি এই অন্ধ বিশ্বাস, যাহা কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে নিপীড়নের একটি পন্থা—জনগণের ক্ষেত্রে কুসংস্কার, অহিফেন—এগুলির পরিবর্তে নাস্তিকতা কি জনগণের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়?

যদি এইসব জিনিসের একই বাস্তব সত্তা থাকে, তবে উহা একদিন সকলের দ্বারাই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যাহা অপরিহার্য, তাহা হইতেছে এক অনন্য সত্তায় বিশ্বাস—সমগ্র জীবনে প্রকাশিত—চেতনা ও মহাজাগতিক শক্তি—এবং সেই ঐক্যের সহিত সচেতন মিলনের অনুসন্ধান (প্রকৃতপক্ষে, সেই মিলন বরং সেই তদাত্মকতা চিরকালই আছে।)—কোনও ধর্ম, কোনও রহস্যবাদের অপেক্ষা বলশেভিকদের মহৎ কর্মের মধ্যেই আমি তাহা সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

আর অন্যসব কিছু—আত্মার অমরত্ব, মরণোত্তর জীবন, আবার দেহধারণ, অলৌকিক অবস্থা ও ক্ষমতা, ইত্যাদি—এগুলি সবই সত্য-বলিয়া-ধরিয়া-লওয়া জিনিস, এখনও যাহা প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয় নাই,—একদিন হইবে—কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব আমার

একমাত্র বিশ্বাসকে, আমার একমাত্র ধর্মকে—ঐক্যের প্রতি বিশ্বাসকে—দুর্বল করে না, কিছুমাত্র আঘাত করে না।

এই ভাবিয়া আমি আপনাকে লিখিতেছি যে, একদিকে শক্তি-দীক্ষার আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা—অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব—কোন্ কার্যকর সিদ্ধান্ত আমাকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য ইহা আপনার কিছু আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ, বর্তমান যুগের সহিত ও বর্তমান সমস্যাগুলির সহিত তাঁহাদের শিক্ষাকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য আমি নিজেকে খাঁটিভাবে বাধ্য করিয়াই আমার পুরাতন কমরেডদের সহিত মিলিয়াছি। আর তাহা ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণী কি মানবতার সকল মহৎ স্বপ্নের সত্যকার উত্তরাধিকারী নয়?

অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সঙ্গে,

ডি. এম্. জি.

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩২ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিজয়ানন্দ ত্রিসাগো হইতে আসিয়াছেন। তিনি আমার জন্য সর্বাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের নমস্কার লইয়া আসিয়াছেন। তিনি আমাদের সহিত আহার করিলেন। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ তিনি জার্মানিতে কাটাইয়াছেন, সেখানে যোগ সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, এখন যাইতেছেন বুয়েনস্-এয়ার্সে; সেখানে তাঁহাকে এক বছর থাকিতে হইবে; সেখানে একটা ধারাবাহিক শিক্ষাসূচী দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।—তিনি আমার মনে ভালোভাবে রেখাপাত করিতে পারিলেন না। তিনি তরুণ, বয়স ৩৫, গাঢ় বাদামী গায়ের রঙ, গাট্টাগোট্টা সজীব, তীক্ষ্ণ, অসহিষ্ণু, ক্রোধপ্রবণ,—বিরোধীকে বিধ্বস্ত করিতে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করেন, যুক্তির পরিবর্তে যুক্তিহীন উপমা এবং অতি স্থূল ও গতানুগতিক চিত্রকল্প দিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, এবং সন্তোষের সহিত বারবার তাহাতেই ফিরিয়া

আসেন, সেইসঙ্গে হাত-পা নাড়িয়া ব্যঙ্গভরে অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করেন; তিনি নিজেকে জাহির করেন, সব কিছুকেই নস্যাৎ করিয়া দেন, বিশেষত, নস্যাৎ করিয়া দেন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে; কেবল তিনি এবং তাঁহাদের লোকজন—বিশেষ করিয়া তিনিই—সত্যকে জানেন, তিনি এই গর্বিত সুনিশ্চয়তায় আত্মহারা। বৃষস্কন্ধ, অতিশয় আত্মসন্তুষ্ট, সংকীর্ণ ও অনুদার, এবং নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন গ্রাম্য যাজকদের সহিত তাঁহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সুপরিচিত টাইপটির আমাদের জন্য ইউরোপে আসার কোন অর্থ হয় না। আর এইসব উদ্ধত ও উগ্র প্রকৃতির লোক দিয়া যদি দ্বিতীয় প্রজন্ম গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণ বৃথাই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বহুবার কড়া কথা না বলিয়া পারি নাই। প্রথমে তাঁহাকে বলিয়াছি, তাঁহার (নিজের মধ্যে একাত্মতার) 'উপলব্ধি'-র আত্মসর্বস্ব মোহ সম্পর্কে, যে মোহ তাঁহাকে কর্ম হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে বা এইসব কর্তব্যকে তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তির ব্যর্থ সন্তুষ্টির অপেক্ষা হীনতর করিয়াছে। যেসব শিষ্য গুরুর বাণীকে বহ্বাড়ম্বরে বিষাক্ত করিয়া তোলে, তাহাদেরই দল সমাজসেবার সেই আবেগকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে, যে আবেগ বিবেকানন্দকে দগ্ধ করিত। যেসব অসাধু যাজক খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাদের মতোই বিজয়ানন্দ বলিলেন: "হ্যাঁ, তিনিই—বিবেকানন্দই—সমাজসেবায় নামিতে পারেন; কারণ তিনি ছিলেন তিনিই, কারণ, তিনি ছিলেন ঐক্যের উপলব্ধি। আর মূলতঃ এই ঐক্যের উপলব্ধিই আসল। আর তাহাই সবকিছুকে অব্যাহতি দেয়। তাহাই যথেষ্ট সামাজিক কর্ম; কোন কিছু না করিয়া যিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন, তাহা দিয়াই তিনি জগতের উপরে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রূপে কাজ করেন।" এই ছদ্ম-গম্ভীর ধর্মীয় আত্মসর্বস্বতা এবং যাঁহারা জগতের দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন, সেইসব নন্দনশাস্ত্রবিশারদদের আত্মসর্বস্বতার মধ্যে আমি বিশেষ পার্থক্য দেখি না। ইঁহারা যে একই রকম সুবিধাভোগী এবং

নিপীড়িত শ্রেণীর শোষক, তাহা আমি এমন তীব্রভাবে আর কখনও অনুভব করি নাই। আমার আতিথেয়তার কর্তব্য সত্ত্বেও আমি দ্বিতীয় বিষয়টিতে আমার তিরস্কার গোপন রাখিতে পারিলাম না, যখন শুনিতে পাইলাম যে, তিনি প্রচণ্ড অবজ্ঞার সহিত এক অপমানজনক আনন্দে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন। তিনি যদি রবীন্দ্রনাথকে আদৌ ভালো না বাসেন, তবে তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার, যদিও আমি রবীন্দ্রনাথের হইয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের লোকদের নিদারুণ অবিচারের তিক্ততা অনুভব করিলাম। কিন্তু এই সুমহান জীবনের, এই নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের দুঃখ ও বেদনার কথা বলিতে গিয়া যখন তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে–প্রায় ঘৃণাভরে–হাসিয়া উঠিতে ও বলিতে শুনিলাম: "তিনি বেদনা বোধ করিতে পারেন না; বেদনা কী, তাহা তিনি জানেনই না,"—(বেদনা কী তাহা জানেন ঔদরিক, ধূমপায়ী, আত্মসর্বস্ব ও আত্মসন্তুষ্ট এই তরুণ সাধুবাবাটি।)—তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম: "অন্যের বেদনা বিচার করিবার অধিকার কাহারও নাই, কেহ তাহা পারে না। একমাত্র ঈশ্বরই তাহা পারেন। আপনি তরুণ। আপনি কঠোর, আপনার মনের দুয়ার বন্ধ।" তিনি হতভম্ভ হইয়া মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুই তাঁহাকে বদলাইতে পারিবে না।—তিনি সামান্যই পড়াশুনা করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান লইয়া লেখাপড়া করিয়াছিলেন (কিন্তু উহার অভাব দেখিয়া কেহ তাহা সন্দেহও করিতে পারিবে না); যখন তিনি সম্প্রদায়ে যোগ দেন, তখন তিনি রসায়নের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চা চালাইয়া যাইতে পারিবেন কিনা তাহা শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে, শিবানন্দ স্পষ্টই জবাব দিয়াছিলেন: "না, একটা বাছিয়া লইতে হইবে।" তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি পুরাপুরি সন্তুষ্ট। একমাত্র পূর্ণ সত্যকে তিনিই লাভ করিয়াছেন। যেসব বিজ্ঞজন সত্যের সন্ধানে জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মাতব্বর-সুলভ অবজ্ঞা।

তাঁহাদের নম্রতা, মহিমা এবং ত্যাগের সেই মানসিকতা—অন্যের যে আবিষ্কার বিজ্ঞানকে এক পা আগাইয়া লইয়া যায়, তাহার সম্মুখে নিজের আবিষ্কারের গর্বকে ত্যাগ করিতে যে মানসিকতা সর্বদা প্রস্তুত থাকে—সে সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁহার এক মুরুব্বিসুলভ উপেক্ষা। তিনি কেবলই রসাইয়া রসাইয়া রামকৃষ্ণের নাম দিয়া কী একটা ভোঁতা রসিকতা বারবার করিয়া চলিলেন (কিন্তু গোড়ার দিকে দন্ত ছিল না): নাক-ছোঁয়ার দুইটি উপায় আছে, একটা সোজাসুজি, আর অপরটা মাথার পিছন দিয়া হাত ঘুরাইয়া অন্য দিক দিয়া। মানুষের মনের সকল অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের বিপুল চেষ্টা—তাঁহার কাছে সব কিছুই এই হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সাধুটি কিন্তু প্রথম বারেই নাক ছুঁইয়াছেন!—ভালোই তো, ছুঁইয়া-ই থাকুন তাহা হইলে! আর নাক মুছুন!—ইউরোপীয় মনের মহিমা সম্পর্কে এবং তাহার মধ্যে দিব্য ভাব যে অন্য কোনও রূপ ধারণ করিতে পারে, সে সম্পর্কে, তাঁহার কোনও ধারণাই নাই। 'লাকৃসিওঁ ফ্রাঁসেইজ'-এর এক গির্জা-প্রেমিকের মতোই তিনি সংকীর্ণচেতা। পরিবর্তন করিয়াও লাভ নাই! আর আমি নিজেকে বলি, এই ভারতবর্ষ যদি জয়ী হয়, তবে ইউরোপ হাড়েহাড়ে বুঝিবে। চোখের বদলে চোখ!—রাজনীতি সম্পর্কে আপাতঃ-ঔদাসীন্যের নিচে মনের গভীরে লুকাইয়া আছে বাসা-বাঁধা এক জাতীয়তাবাদ। কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীকে যেমন শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণপন্থীরাও তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন গান্ধীকে। কিন্তু এই স্বামীজীটি বলিলেন, তাহার কারণ, "গান্ধীজী সর্বত্যাগের অবতার, আর সর্বত্যাগই সারা ভারতবর্ষের মর্মকথা।"—সর্বক্ষেত্রে ইহা কিন্তু বিজয়ানন্দের মর্মকথা নয়। আর আমার ভয় এই যে, মধ্যযুগে আমাদের জনগণকে যাহারা উৎপীড়ন করিত, পশ্চিমের সেই মঠধারী সম্প্রদায়ের অনুরূপ ঘটনার পরিণামের দিকেই না ইহা ঠেলিয়া লইয়া যায়। মুক্তির কোন মন্ত্রই বাঁচাইতে পারে·

না। পরিপূর্ণতম আগ্রহহীনতার ফলে স্বৈরাচার ও স্বার্থপরতা চিরকালই নিজেদের মধ্যে বিলিব্যবস্থা করিয়া চলিবে।—আর গুরুরাও যেন তাঁহাদের কথাবার্তা সাবধানে বলেন! যে খেয়াল-খুশিতে বলা কথার মধ্যে সত্যের শস্যকণা থাকে, তাহাকে প্রায়ই শস্যকণাহীন খড়ের গাদা বলিয়া মনে করা হয়। সে খড়ের গাদা বিপজ্জনক, অনেক সময় মারাত্মকও। একদিন স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন: "আমি সব ক্ষমা করিতে পারি; যে খুন করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি। যে ধর্ষণ করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি। যে গণহত্যা করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু যে মিথ্যা বলে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি না। কারণ, মিথ্যা হইতেছে চেতনার মৃত্যু।"—আর আমিও ইহা বুঝিতে পারি। আমিও এই-ভাবেই ভাবি। কিন্তু যে তরুণ সাধুবাবারা শুনেন, তাঁহারা, আমার ভয় হয়, মিথ্যার প্রতি ক্ষমাহীনতার অপেক্ষা অন্যান্য অপরাধের প্রতি বিপজ্জনক ক্ষমাকেই না আঁকড়াইয়া থাকেন!

বিদায় লইবার সময় বিজয়ানন্দ একটু লজ্জিত হইলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন আমাকে তিনি জ্ঞানালোক দিতে পারেন নাই। তিনি যাহা কিছু বলিয়া থাকিবেন, সেজন্য ক্ষমা চাহিলেন।—কিন্তু কালই তিনি আবার শুরু করিবেন।

তিনি বলিলেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের অনেকেই বাঁচিয়া আছেন (যদিও গত বৎসর তাঁহার জীবনীকার ও অন্যতম প্রধান দ্রষ্টার মৃত্যু হইয়াছে)। কিন্তু প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মহান্ গোষ্ঠী শিবানন্দের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা আর নূতন করিয়া হইবে বলিয়া মনে হয় না।—বিজয়ানন্দ বলিলেন, রামকৃষ্ণের অধিকাংশ শিষ্যের মতোই শিবানন্দ এক স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শিশুসুলভ প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।—কিন্তু সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার দৃঢ় কর্তৃত্ব নাই, যে কর্তৃত্ব ছিল তাঁহার পূর্বসূরী ও সঙ্গী ব্রহ্মানন্দের। বিজয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, এবং মৃত্যুকালে ব্রহ্মানন্দ

তাঁহাকেই নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন ("ভ্রাতঃ, এই সন্তানদিগকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করিতেছি।")

জুনের শেষ, ১৯৩৩॥

বাঙালী গায়ক ও লেখক দিলীপকুমার রায় কয়েক বৎসর যাবৎ পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে আছেন এবং তাঁহার প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—সম্ভবত তাঁহার প্রভাবে ততটা করেন নাই (কারণ তিনি এক গোপন সূর্যের মতো, তিনি তাঁহার বিচ্ছুরিত আলোকই শুধু দেখিতে দেন), যতটা করিযাছেন তাঁহার চন্দ্র, মিরিয়াম, মীরা, 'শ্রীমা'-র প্রভাবে;—এই চৌকশ বুদ্ধিমতী মহিলা অরবিন্দকে আয়ত্ত ও পরিচালিত করিতে জানেন,—কার্যতঃ ইনিই তাঁহার আশ্রম পরিচালনা করেন। ৩০০ কপি মুদ্রিত ছাপ-দেওয়া ও মীরার স্বাক্ষর করা 'শ্রীমার সঙ্গে আলাপাচারি' নামে একখণ্ড চমৎকার ফরাসী বই তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অরবিন্দের স্বতঃ-উপলব্ধিমূলক বা অতীন্দ্রিয় ধ্যানধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং আমার ধারণা যে, দিলীপকুমারের মাধ্যমে তিনি আমাকে বড়শিতে গাঁথিতে চান।

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলাম, প্রশংসা করিলাম এবং এই কথাও লিখিলাম (২৮শে জুন):

"...নূতন জীবনকে অনেক পরে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিবার জন্য ভগবানের বুকে ঠাঁই লওয়া আমাদের মতো পাশ্চাত্যের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদিগকে এখনই ছুটিতে হইবে নিপীড়িতকে—নিপীড়িত মানুষ ও জাতিকে—সাহায্য করিতে, তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যও বর্তমান কর্ম হইতে মনকে সরাইয়া লইবার অধিকার আমরা স্বীকার করি না। 'এক' সবকিছুকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং যে অসংখ্য স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তিনিই তাহা নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহা জানা ও উপলব্ধি করা আমার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের

পক্ষে বৃথা ; আমার পারাপারের জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হইতেছে, এই স্রোতে যাহারা ডুবিতেছে তাহাদিগকে বাঁচানো, নয়তো তাহাদের সহিত ডুবিয়া মরা। "আর্ত-নিপীড়িতই আমার ঈশ্বর"—বিবেকানন্দের এই বাণীই আমার অস্থিমজ্জায় লেখা আছে, যদিও আমি জানি যে, সত্তার প্রাচুর্য সীমাহীনভাবেই দুঃখদুর্দশা ও দৈনন্দিন সংগ্রামকে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ইহা সুসম্পন্ন করিতে সত্তার পক্ষে আছে অনন্ত কাল ; আর আর্ত-নিপীড়িতের আছে শুধুমাত্র একটি দিন। যাহাদের সবচেয়ে কম আছে, বেশির অধিকার তাহাদেরই··· ।"

জুলাই, ১৯৩৩ ॥

এই গ্রীষ্মকালে চিকাগোয় ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় সম্মেলন হইবে (প্রথম সম্মেলনে বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন)। ওখানে বক্তৃতা দিতে, নয়তো অন্ততঃপক্ষে একটা বাণী পাঠাইতে, আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছে। 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব ফেইথ্স্'-এর জাতীয় সভাপতি বিশপ ফ্রান্সিস জে. এস্, কনেলকে ( স্পিয়েজ হইতে, ২৪শে জুলাই ) যাহা লিখিয়া পাঠাইলাম, তাহা এই :

"নর-দেবতা খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন : "আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।"—এই সুমহৎ বাণী এক বিশ্বাসের গর্ভ হইতে এক নদীর মতো দুকূল প্লাবিত করিতেছে। ইহা সকল বিশ্বাসের মানুষের পক্ষে —এবং বিশ্বাসহীনের পক্ষে ( বা যাহারা বিশ্বাসহীন বলিয়া নিজেদিগকে মনে করে তাহাদের পক্ষে, কারণ, বিশ্বাসের জোরে খাড়া না থাকিলে কেহ কি বাঁচিত ? ) মূল্যবান্। সত্য ও জীবন অজ্ঞাত-ঈশ্বর, যাহার মধ্যে আমরা আছি, সঞ্চরণ করিতেছি—হাওয়ার মধ্যে, জলের মধ্যে, পাখীরা ও মাছেরা যেমন সঞ্চরণ করে। সত্য ও জীবনই আমাদের মৌল উপাদান, আমরা তাহার 'অন্তঃস্থল'। তাহার বাহিরে আমরা থাকিতে পারিতাম না। সত্য ও জীবন আমাদের অনন্ত সত্তা। এবং আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব হইতেছে চৈতন্যের আনুপাতিক,

যে-চৈতন্য সত্তার সহিত আমাদিগকে পুঞ্জীভূত করে। আমাদের উদ্ভব, রক্ষণ ও বর্ধনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এই চৈতন্যকে বর্ধিত করিতে, গভীর করিতে, আরও বেশি করিয়া সেই সত্য ও জীবনের সহিত—যাহা হইতে জীবন্ত পরিবেশ, যাহার বাহিরে আমরা মাছের মতোই শুকাইয়া মরিতাম—অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করে। আর যেমনভাবে নদীর মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি প্রাণীতে তরঙ্গের প্রতিটি স্পন্দন প্রচারিত হয়, আমরাও তেমনি আমাদের রক্তে মাংসে আমাদের সমগ্র বিশ্বের নিকট ও দূর স্পন্দন অনুভব করি। আমাদের মধ্যে মহত্তম নর-দেবতা তিনিই হইবেন, যিনি নিজের বুকে তাঁহার সবকিছুকে আলিঙ্গন করিবেন।

এই মৌল উপাদান—আমাদের নদী—বহিয়া চলিয়াছে। স্রোতের মুখে নিঃস্পন্দ হইয়া এক ধরনের মাছ যেমন স্বপ্ন দেখে, তেমনি ধ্যানযোগে উহার মধ্যে আত্মীভূত হইলে যথেষ্ট হইবে না। জীবন আগাইয়া চলিতেছে। সত্য একটা প্রবাহ। কোন কিছুই অনড় নয়। কোন কিছু বদ্ধ ও স্থির নয়। নদীর ঢল ও প্রবাহের মধ্যে তাদাত্ম্য ঘটাইতে হইবে। এই প্রবাহকে বরণ করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের সহিত জীবন্তদের মধ্যে টানিয়া আনার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সক্রিয় হইতে হইবে। সত্য ও জীবনের সেই শক্তি যাহা জগৎকে সম্মুখে বহিয়া লইয়া যায়, তাহার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে।

প্রবাহ কোথায় যায়?—যায় মহাসাগরের দিকে, যায় জীবন্ত একের দিকে।

আমি প্রায়শঃই আমার রচনায় আগাগোড়া নদী ও সাগরের চিত্রকল্প ব্যবহার করিয়াছি। (আমার 'আম আঁশাঁ'-র [ 'বিক্ষুব্ধ আত্মা' ] পরিবারের নাম 'রিভিয়ের'। আর আমার জঁা ক্রিস্তফ্ রাইন নদী, পথ বাহিয়া চলিয়াছে সমুদ্রের দিকে।) আমার কাছে এগুলি রূপক নয়। এগুলি আমার অন্তরের নদীর কথা।

সমস্তই চলিয়াছে একের দিকে। আমাদের সত্তার সকল নদী।

আমাদের সকল লম্ফ ঝম্ফ, আমাদের সকল প্রচেষ্টা, আমাদের সকল সংগ্রাম, আমাদের সকল নৈরাশ্য এক মহাপ্রবাহের ঘূর্ণিপাক। সকল কিছুরই লক্ষ্য মহাসাগরীয় ঐক্যের দিকে, চলমান জনসংঘাতের ঐকতানের দিকে। যে ঐকতানে সুসমন্বিত হইয়া উঠে লক্ষ সত্তা।

কিন্তু, ঐ ঐকতান সম্পন্ন করা কেবল একক অহংসর্বস্ব স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা কেবল এক বিচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই মুক্তি দিতে পারে। তাহা সম্ভব কেবল সকল জীবন্তের মধ্যে আলাপনের মাধ্যমে। আমাদের প্রত্যেককে কেবল ইহাই চাহিতে হইবে, এবং তাহা বাস্তবে পরিণত করার জন্য কাজ করিতে হইবে।

"যে চিন্তা করে, সে সক্রিয় হয়"—ইহা বলা সত্য নয়। বরং বলা উচিত, "যে চিন্তা করে, তাহাকে সক্রিয় হইতে হইবে।"

ক্রিয়া ছাড়া কোন চিন্তাই বাস্তব, সম্পূর্ণ ও জীবন্ত নয়। ক্রিয়া ছাড়া তাহা ছায়ামাত্র, রক্তহীন। আর যে সক্রিয় হয়, তাহার চিন্তাতে যেমন, তাহার ক্রিয়াতেও তেমনি, সব সময়েই ঝুঁকিতে হইবে বিশ্বজনীনের দিকে—সত্যের দিকে ও জীবনের দিকে, এককের দিকে নয়, সকল সত্তার দিকে ; যে যতো বেশি জীবন্ত, সে ততো বেশি জীবনকে আলিঙ্গন করে। আমাদের সম্পদ অপরের সম্পদ হইয়া উঠা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকে। আর যাহারা বেশি জীবন্ত, তাহাদের কর্তব্য হইল নিজেদের সত্তা দিয়া কম জীবন্তদের লালন করা, দুর্বল ও পীড়িত, নিপীড়িত ও আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। বিবেকানন্দের মহিমময় ঘোষণা। "আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর"—আমাদের প্রাণশক্তির কাছে উপযুক্ত আহ্বান। যাহারা সঞ্জীবনী আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত, যাহাদিগকে তাহা জয় করিতে হইবে, সেইসব ব্যক্তি ও মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিবর্তিত হন।

"যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তিনি ঈশ্বরের পক্ষ সমর্থন করুন সেইসব লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে, যাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও অন্যায় নিপীড়িত করিতেছে। কারণ, তাহারাই হইতেছে নিপীড়িত

সত্য ও জীবন, যাহারা জীবন্তের ঐক্যের জন্য আকুল কামনা করিতেছে।”

এপ্রিল, ১৯৩৪ ॥

* * * এখন নির্ভুলভাবে সেই শ্রীমতী-র পত্র পাইলাম। * * * পত্রের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটা ছাপা : “শান্তির জন্য। বিশ্বের সকল আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশে মাতা ও নারীদের আবেদন।”

* * * আমি তাঁহার পত্রের উত্তর দিলাম ( ১৭ই এপ্রিল ) :

“প্রিয় মহাশয়া, মনে ভাবিবেন না যে, আপনার পত্রের উদারতা সম্পর্কে আমি উদাসীন—এত বিলম্বে এই পত্রের উত্তর দিতেছি বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। পত্রটি আমাকে অভিভূত করিয়াছে।—কিন্তু আপনাদের সংঘের আবেদন ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না।—প্রথমতঃ ‘সকল মতের ধর্মীয় নেতাদের’ আমি পুঁজি করিতে পারি না,—অতীতে তাঁহাদের কাছে আমি ভরসা দেওয়ার অপেক্ষা বেশি কিছু চাই নাই ; কিন্তু গত বিশ বৎসরের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহারা জগতের সম্মুখে শোচনীয়ভাবে কার্যতঃ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহারই ‘সেবা’ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা ‘আত্মার’ ( অথবা যাহা আরও বেশি ভালো হইত—মানবতার ) সেবা করেন নাই ; সকল কিছুর আগে তাঁহারা বাঁধা ছিলেন তাঁহাদের সুযোগ-সুবিধা ও তাঁহাদের সংস্কারের কাছে, যাহা ঈশ্বরকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ, এবং ইহাই মুখ্য,—নেকড়ে ও ভেড়ার মধ্যে, অত্যাচার ও অত্যাচারিতের মধ্যে, ‘পবিত্র ঐক্যের’ কথা বলা অর্থহীন—যেমনটি জগৎ আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে হাজির করিতেছে। সমস্ত বর্তমান সমাজ দাঁড়াইয়া আছে এক বিপুল অন্যায় ও অবিচারের স্তূপের উপর, উহার বেশির ভাগই ‘পবিত্রীকৃত’ ; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঐ স্তূপ ধ্বসিয়া পড়িতেছে, মাটি যেভাবে ধ্বসিয়া পড়ে ভূমিকম্পে। ভেড়ার

মতো ক্ষীণকণ্ঠে ঐক্যকে ডাকিয়া কি লাভ হইবে? যাহার যে নাম, সেই নামই তাহাকে দিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে নিশ্চয়ই; কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে, যাহার জন্য আমরা সকলেই মিলিতভাবে দায়ী। এবং এইসব অন্যায় ও অবিচারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভয় পাইলে চলিবে না।—এমন কি (বিশেষতঃ) সেগুলি যদি আমাদের স্বদেশ, আমাদের শ্রেণী, আমাদের মনের সুযোগ-সুবিধা, যাহা আমাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে (বা আমরা যাহাতে আরোপিত হইয়াছি), বিভিন্ন সংস্কার—যেখানে আমরা উন্নীত হইয়াছি এবং যেখান হইতে বিচ্যুত হওয়া কঠিন—এসব কিছু পাওয়ার জন্যও হয়।

আমার কিছুটা ভয় (ভয়ের কিছু জোরালো কারণ) আছে যে, কেবল সমস্ত মতের ধর্মীয় নেতারা নন, মানবগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক নেতারাও (তাঁহারা কারা) আপনাদের নামমাত্র সাহায্যও করিবেন কি না। যাঁহাদের নাম নেতা, তাঁহাদেরই নাম সুযোগ-সুবিধা, যাঁহাদের নাম সুযোগ-সুবিধা, তাঁহাদেরই নাম চোখে-বাঁধা রঙিন ঠুলি; আর তাঁহাদের সংখ্যা খুবই অল্প, যাঁহাদের প্রবণতা আছে ঠুলি খুলিয়া ফেলিবার দিকে, যাহাতে তাঁহারা দেখিতে পান কোন্ অত্যাচারিত মানবতার মূল্যরূপে এইসব সুযোগ-সুবিধা তাঁহাদিগকে উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। আমি একটিমাত্র 'পবিত্র ঐক্যকে' জানি—তাহা হইতেছে সারা দুনিয়ার অত্যাচারিতের সঙ্গে ঐক্য——'আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর,' বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষের বিবেকানন্দ—আর তাহা ইউরোপের খ্রীষ্টও বলিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে—আর এই একই মন লইয়া, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র লইয়া, লড়াই করিতেছেন গান্ধীরা ও লেনিনরা। আমি তাঁহাদেরই বাহিনীর এক যোদ্ধা।"

১লা মে, ১৯৩৫ ॥

স্বামী যতীশ্বরানন্দ আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন পল

গেহিব। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাকে ইউরোপে মিশনের কাজে পাঠাইয়াছেন এবং প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তিনি জার্মানি, পোল্যাণ্ড, এমন কি সুইজারল্যাণ্ডেও ঘুরিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজকর্মের কোন পরিচয় দেন নাই। তাঁহার সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উচ্চ হইল না। এই তরুণ, সজীব, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে সজ্জিত, কথাবার্তায় লঘু ও অগভীর ব্যক্তিটিকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি অদ্ভুতভাবেই তাঁহার মিশনের কাজ করিবেন। তাঁহাকে ছয় মাসের জন্য পাঠানো হইয়াছিল, তিনি তাঁহার উর্ধ্বতনদের জানাইয়াছিলেন, তিনি আরও ছ বছর থাকিতে পারেন। তাহা আমি ভালো করিয়াই জানি। তাঁহার তাড়াহুড়া নাই। তাঁহার সমস্ত কাজকর্মই মনে হয়, ভালো ভালো হোটেলে বা হামবড়া ও স্বামীজী-ক্ষেপা ধরনের দানশীল গৃহস্বামীদের গৃহে গৃহে আস্‌কোণায়, হ্বেইজবাডেনে শুইয়া-বসিয়া কাটানো। তিনি জার্মানিতে গ্লাজনাপ বা রুডলফ্‌ অটোর মতো কোন বড় ভারতবিদ্‌ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করার ঝামেলায় যান নাই, অথচ তাঁহাদের 'সেমিনারগুলি' জার্মান ভাষায় বিবেকানন্দের রচনাবলী অনুবাদের কাজে তাঁহাকে ভালোভাবেই প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারিত,—এ কাজের ভার তাঁহার উপরই আছে। বেশি কথা কি, ভারতবন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতেও তিনি এখনও প্যারিসে যাওয়ার চেষ্টা করেন নাই। তিনি ব্যাপারটা এড়াইয়া যাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন, 'যখন ভবিতব্যের ডাক আসিবে,' তখন তিনি সেখানে যাইবেন। এইসব ধাপ্পা আমার জানা আছে। উহাতে আমি ভুলি না। তাঁহার ভবিতব্য, সে তো তাঁহার খেয়াল।

পল গেহিবকে তাঁহার অডেনওয়াল্ডের বিখ্যাত বিদ্যালয়টি ছাড়িয়া দিতে এবং এক বছরের কিছু বেশি হইল জেনেভায় আস্তানা গাড়িতে হইয়াছে। সেখানে তিনি নূতন একটা স্কুল খুলিয়াছেন, সেটা ভালোই দাঁড়াইয়াছে, ইহার মধ্যেই জন পঞ্চাশেক ছাত্র হইয়াছে।

আমার দুই অতিথিই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, এবং বিশেষভাবে বলিলেন জার্মানির ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে,—নৈতিক আতঙ্কের পরিবেশ সম্পর্কে,—সর্বত্র তাঁহারা যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৬॥

আমার বোনের বাড়িতে মিস্ ম্যাক্লেঅড প্রাতরাশের জন্য জে. এরবেরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। (এরবের 'লীগ অব নেশন্‌স্'-এর অনুবাদক, বিবেকানন্দের রচনাবলী ফরাসী ভাষায় অনুবাদের ভার লইয়াছেন।) বিবেকানন্দের এই পুরাতন বান্ধবীটি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন, মাঝে সরবনে রামকৃষ্ণ-স্মৃতিসভায় (অধ্যাপক কোশে, মাসনুর্সেল প্রভৃতির সঙ্গে) যোগদানের উদ্দেশ্যে কয়েকদিনের জন্য প্যারিসে আসিয়াছিলেন। তিনি তেমনি আছেন তাঁহার অক্ষয় পরমায়ু লইয়া, তেমনি আছেন হাসিখুশি। তিনি বেলুড়ের (রামকৃষ্ণ) সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিপূর্ণ নবজাগরণ দেখিয়াছেন। সম্প্রদায়ের নূতন অধ্যক্ষ অখণ্ডানন্দ আগের জনের (স্নেহময়, পবিত্র ও প্রশান্ত শিবানন্দের) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনি নির্জনতাপ্রিয়, কঠোর নীতিপরায়ণ, উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, বেশ কয়েক বছর তিব্বতে ছিলেন এবং বেলুড়ে আসিয়া থাকিতেও অস্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি কিছুটা দূরে আলাদা হইয়া থাকেন, কিন্তু দৃঢ়-হস্তে পরিচালনা করেন। এরবের ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিয়াছেন; তিনি বলিলেন, সেখানে আমার কী জনপ্রিয়তা, যেসব ভারতীয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, তাঁহাদের কাছে ফ্রান্স বলিতেই রোমাঁ রোলাঁর দেশ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলি যে ইউরোপের, এবং বিশেষতঃ ফ্রান্সের, মনের মধ্যে ঢুকিয়াছে, বইয়ের দোকানের হিসাব কার্যতঃ তাহার কোন ধারণাই দেয় না।

ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

রামকৃষ্ণ মিশন আমাকে এক ধর্ম-মহাসভায় আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তাহা আগামী বছরের গোড়ার দিকে কোনও মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। আমি যাইতে পারিব না জানাইয়া একমাস আগে চিঠি দিয়াছিলাম। সুইশ ডাক-বিভাগ হইতে আমাকে জানানো হইয়াছে যে, সেইদিনের ভারতবর্ষের সমস্ত ডাকের সহিত আমার চিঠিখানি মেল ভ্যানের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। কমিটির সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দকে আমি আবার চিঠি দিলাম। আমার দুঃখ আবার নূতন করিয়া জানাইলাম :

"কখনও ইহা মনে করিবেন না যে, আমার চিন্তা-ভাবনা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত নাই। ধর্মসভাকে আমার সৌভ্রাত্রমূলক নমস্কার জানাইবেন। মানবাত্মার সকল বৃহৎ শক্তি, বিশ্বজনীন জীবনে বিশ্বাসের প্রাণশক্তি এবং সকল মানুষের জন্য সক্রিয় প্রেমের শক্তির মধ্যে আপোস ও মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা আমার মতো সারা জীবন আর কেহই পোষণ করে নাই। জীবন্ত সকল কিছুর প্রতি প্রেমের প্রভু আমাদের প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এমন একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, সেজন্য আমি আনন্দিত।

ধর্মসভায় যাঁহারা যোগ দিতেছেন, তাঁহাদের সকলকে আমি সমাজ-সেবার দিকে, মাটির মানুষের দিকে, তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে অধিকতর প্রসারিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। জগতের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিপীড়িত ও বলিপ্রদত্ত জাতিগুলি এমন এক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যে শোষণ আরও অনেক বেশি করিয়া মানুষকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধিতে চায়, যে শোষণ আরও অনেক বেশি নির্মম। আসুন, আমরা সামাজিক সুবিচারের আবির্ভাবের সহায়তার জন্য কাজ করি। যাহারা দরিদ্র, যাহারা

খাটিয়া খায়, আর যাহারা কষ্ট পায়—আমাদের স্থান হইতে হইবে তাহাদের পাশে।”

২০শে জুন, ১৯৩৭ ॥

জঁ। এরবের তাঁহার সহযোগী কুমারী রেমঁ-র সঙ্গে ভিল্লা লিঅনেতে আমার বোনের বাড়িতে আহার করিলেন এবং রবিবার বিকালটা কাটাইলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি তিন মাস কাটাইয়াছেন। ধর্মমহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী দিয়া। তিনি পণ্ডিচেরিতে গিয়াছিলেন, সেখানে অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে ছিলেন এবং তাঁহার মোহে পড়িয়াছেন। তিনি আমার মধ্যে সেই মোহ সঞ্চারিত করিতে পারিলেন, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। * * কিন্তু তাঁহার (শ্রীঅরবিন্দের) কৃতিত্বকে স্বীকার করিলেও, তাঁহার আভিজাত্যবাদকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে কষ্টকর। উহা ধনীদের এক আশ্রম। আমাদের দুঃখদৈন্য ও নিপীড়ন হ্রাস করিবার বেদনাময় এই সংগ্রামের যুগে তিনি আরামপ্রদ এক আশ্রমে নিতান্ত স্বার্থপরের মতো নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যাহাতে সেখানে তিনি নির্বিবাদে তাঁহার বিকাশের পরিপূর্ণতার অনুসন্ধান করিতে পারেন। আধুনিক ভারতবর্ষের মহান্ চিন্তাবীরদের সম্পর্কে আমার বইগুলির পরে আর অন্য কাহারও সম্পর্কে লিখিতে অনুরোধ করিয়া লাভ নাই, আমি বাংলাদেশের দীন-দরিদ্র রামকৃষ্ণেই থামিয়া থাকিব।

রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এরবের বলিলেন যে, মিশন সর্বত্র সামাজিক কর্ম ছড়াইয়া দিয়াছে; দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সেবাদল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও গঠন করিয়াছে। বেলুড়ের নূতন প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণের শেষ প্রত্যক্ষ শিষ্যদের একজন। তিনি একান্ত বৃদ্ধ, এবং একান্তে থাকেন। রামকৃষ্ণ উৎসবে গান্ধী আসেন নাই, কিন্তু সেখানে

তাঁহার দুই মুখ্য শিষ্য প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন ক্যালেলৃকার। এরবের বলিলেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও গৌরবের বিশ্বব্যাপী বিস্তার আমার বইগুলির জন্যই হইয়াছে, একথা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এরবের ও কুমারী রেমঁ স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ অ্যাভনে বিবেকানন্দের পুরানো বান্ধবী মিস্ ম্যাক্‌লেঅডের বাড়িতে গিয়াছিলেন; সেখানে নিবেদিতার ভগিনীর সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল। তাঁহারা নিবেদিতার একটা দিক্ সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন—ভারতবর্ষে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিক্‌টা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নিবেদিতা বিপ্লবী আন্দোলনে যথেষ্ট পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি অনেক প্রবন্ধে তিনি অরবিন্দের নাম সই করিতেন (ঐ সময় বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য অরবিন্দ আত্মগোপন করিয়া ছিলেন এবং পুলিস তাঁহাকে খুঁজিতেছিল)। নিবেদিতার এই কাজকর্ম লোকচক্ষুর গোচরে আসুক, —ইহাতে মিস্ ম্যাক্‌লেঅড বিশেষ উৎসাহিত হন নাই। এ বিষয়ে মিস্ রেমঁ পড়াশুনা করিতে চাহিতেছেন। গান্ধী এখন যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের হাল ধরিয়াছেন, যাহা তাহার দিগন্তমন্দ্রিত গৌর-চন্দ্রিকা ছিল—বাংলাদেশের সেই বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের (রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ) সহিত অকালে পরলোকগত বিবেকানন্দের সম্বন্ধের বন্ধনসূত্রটি নিবেদিতার মাধ্যমে ধরা যাইতে পারে। * * *

২৯শে জুন, ১৯৩৭॥

এরবের রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য আমার লেখা পুরাতন একটি প্রবন্ধ, 'জীবই শিব' হইয়াছেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে বেদান্তবাদ সম্পর্কে তিনি যে নূতন পত্রিকাটি বাহির করিয়াছেন, প্রবন্ধটিকে তাহার গোড়ার দিকে দিতে চান। কিন্তু তিনি একটি বাক্য কাটিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, উহাতে আমি রোমান চার্চের নির্লজ্জতার নিন্দা

করিয়াছিলাম,—যে রোমান-চার্চ প্রকাশ্যেই বলে, প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গেই ভগবান আছেন, অবশ্য সে শক্তি যদি চার্চ যেসব সুবিধা ভোগ করে, সেগুলিকে মানিয়া চলে। আমি তাঁহাকে উত্তর দিলাম (২৯শে জুন):

ইহা নিঃসন্দেহ, আমার একটি প্রবন্ধ যে আপনার পত্রিকায় ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি চাই না যে, তাহাকে প্রয়োজনমতো কাটছাঁট করিয়া ব্যবহার করা হোক। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা স্মরণ করুন: প্রতিটি মানুষকে নিজের পথেই বিকশিত হইতে হইবে। বেদান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকিলেও—আমার পথ বেদান্তের পথ নয়। আমার পথ 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্'-এর পথ, যাহা ভণ্ডামি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ধাবিত হয়। এবং সেই মনই বয়সের সঙ্গে নিজেকে সপ্রমাণ করিয়াছে। রোমের মোহান্তরা, যাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র আসন সুন্দর করিতে শয়তানের সহিত কারবার করিতে চান (তাঁহারা তাহা বলিয়াছেন!)—তাই তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমি যাহা পারি, তাহা হইতেছে, উহা লিখিয়া অন্যান্য চার্চ সম্পর্কেও আমার নিন্দাকে প্রসারিত করা:

"ইতিহাসের গতিপথে, অতীতে ও বর্তমানে, চার্চের নেতাদের প্রায়শঃই নীতি ছিল এবং আছে—সকল বিজয়ী শক্তির পাশে গিয়া দাঁড়াইবার—যদি সেই শক্তি শুধুমাত্র তাহাদের ভোগ-করা সুবিধাগুলিতে হস্তক্ষেপ না করে। এইভাবেই তাহারা শক্তির কায়েম-করা অবিচারের সহিত নিজেদিগকে যুক্ত করে।"

অক্টোবর, ১৯৩৭॥

যখন ফ্রান্সে ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে আমি কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রেরিত দুইখণ্ড 'কাল্‌চার‌্যাল হেরিটেজ অব্ ইণ্ডিয়া' পাইয়াছি। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের ফল ভারতীয় চিন্তার

বিপুল বিকাশকে মুগ্ধ প্রশংসা করিতে হয়। আমি (স্বামী অবিনাশানন্দকে লিখিত পত্রে) রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ জানাইলাম। জঁা এরবের অসামান্য কর্মশক্তি ও আবেগদীপ্ত উৎসাহ লইয়া বিবেকানন্দের রচনাবলীর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের চিন্তা পশ্চিমে ছড়াইতেছেন। * * *

৩০শে মার্চ, ১৯৩৮ ॥

জঁা এরবের ও তাঁহার তরুণী পত্নী স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে লইয়া আমার ভগিনীর বাড়িতে আসিয়াছেন; আমার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন; তিনি ফ্রান্সে স্থির হইয়া বসিবেন এবং একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। ফ্রান্সে তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রতিনিধি; এবং এ-বিষয়ে আমিই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছি। এ পর্যন্ত লাতিন দেশগুলি সম্পর্কে ভারতীয়দের একটি বিরুদ্ধ-সংস্কার ছিল; তাঁহারা কেবল অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। সে ত্রুটি আমি শুধরাইয়া দিয়াছি; আর যে চিঠিতে সিদ্ধেশ্বরানন্দকে কাজের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই এই কথা বলা হইয়াছে: "আমরা বিশেষ আনন্দিত যে, আপনি আমন্ত্রণ পাইয়া ফ্রান্সে যাইতেছেন; শুধুমাত্র ফ্রান্স এমন এক দেশ যাহার সংস্কৃতিতে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার কোনও কোনও সুন্দরতম উপাদান ও গুণ আছে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি এমন নহে, তাহাকে আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে রামকৃষ্ণের চিন্তা-ভাবনার সেই মহান্ ব্যাখ্যাতা ম. রোমাঁ রোলাঁর স্বদেশ বলিয়াও।" দুই মাস হইল স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ প্যারিসে আসিয়াছেন; ইতিমধ্যেই তিনি ফ্রান্সের সেই আত্মিক ঐশ্বর্যের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাহা অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত যুক্তিবাদের মিলন ঘটায়; আর তিনিও তাহার

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। (তিনি কিছুটা ফরাসী বলিতেও শুরু করিয়াছেন।)

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের করুণ পরিণতি সম্পর্কে কিছু কিছু খুঁটিনাটি তথ্য স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাকে দিলেন। ধনগোপাল ছিলেন মহৎ শিল্পী, তিনিই আমার নিকট রামকৃষ্ণকে প্রথম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি মানসিক অশান্তির পরিচয় দিতেছিলেন, এমন কি তাঁহাকে মানসিক হাসপাতালে আটক রাখাও হইয়াছিল। সন্ন্যাসী হইবার জন্য, নিজেকে নির্জনতায় সরাইয়া লইবার জন্য, তাঁহার আবেগময় তীব্র বাসনা এবং বিবাহের মাধ্যমে তিনি যে মার্কিন জীবনযাত্রায় প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদের বেদনা তিনি ভোগ করিতেছিলেন। তিনি কখনও মনঃস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (তাঁহার মৃত্যুর পরদিনও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তাঁহার একটা চিঠি পাইয়াছেন); স্বামী অশোকানন্দের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রীতিপূর্ণ উপলব্ধির সহিত স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তাঁহার কথা বলিলেন; অশোকানন্দের আপোসবিরোধী কঠোরতা আমাকে মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার উদগ্র কল্পনা যখন সত্যকে তাঁহার নিকট বিকৃত করিয়াছে, এমন কি তখনও তিনি গভীরভাবে ঐকান্তিক ছিলেন। আমার মনে হইল, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ মহৎ মানবিক বোধের মানুষ, যে মানবিক বোধ বৃহৎ, সহিষ্ণু ও উপলব্ধিক্ষম,—কখনই কাহাকেও ধর্মান্তরিত করিতে অভিলাষী নয়, কিন্তু প্রত্যেককে নিজের আত্মিক প্রবণতা অনুসারে (রামকৃষ্ণের প্রকৃত মর্মানুসারে) পরিপূর্ণতমরূপে নিজেকে বিকশিত করিতে চালিত করে। তিনি রামকৃষ্ণের মহান্ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য; গুরুর প্রত্যক্ষ অলৌকিক উদ্দীপন-ক্ষমতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত

করিয়াছেন, এবং অনেক গোপন কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন,—সেগুলির কিছু কিছু সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাদিগকে শোনাইলেন।

এরবের দম্পতিকে আগামী নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে গিয়া আবার নূতন করিয়া চার মাস থাকিতে হইবে; ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে একখানি বই লিখিবার জন্য শ্রীমতী এরবের সেখানে নিবেদিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে চান।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮॥

জেনেভা হইতে জঁা এরবের তাঁহার ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত কয়েক মাসের জন্য ভারত-ভ্রমণে যাইতেছেন। বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা সম্পর্কে একটা বড় কাজের জন্য তাঁহারা একসঙ্গে যাইতেছেন, এবং তাঁহার শতখানেক চিঠি এবং যে কাগজপত্র বিশেষত ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের মহাফেজখানায় তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন, সেগুলি এই চরিত্রটির উপর অপ্রত্যাশিতরূপে আলোকপাত করিবে। ইহা আর শুধুমাত্র বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয় নহে, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি প্রথম সারিতে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়-ও। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে অরবিন্দ ঘোষ ও তিলকের পাশে দাঁড়াইয়া তিনি (অন্তরাল হইতে) সংগ্রাম করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড উৎসাহে তিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং ইংরেজ পুলিস তাঁহার পিছু লইয়াছে। তিনি প্রায়ই ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, সেখানে বিরোধী দলকে ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি আগ্রহান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; বিশেষত তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেইর হার্ডির সঙ্গে। তাঁহার মধ্যে ছিল তাঁহার আইরিশ রক্তের অগ্নিশিখা, এবং তাহা হইতেই তিনি তাঁহার বিপ্লবী আবেগকে ভারতবর্ষের খাতে বহাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল বুদ্ধিমত্তা তাঁহাকে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় সহযোগীও করিয়া

তুলিয়াছিল। যখন জগদীশচন্দ্র বসু রচনাকৌশলে ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন না, তখন নিবেদিতাই এই প্রতিভাধর পণ্ডিতের প্রথম গ্রন্থগুলির সংস্কারসাধন করিয়া দিয়াছিলেন। নিবেদিতা জানিতেন, কীভাবে তাঁহার জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহ করিতে হয়, যাহা কলিকাতায় জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য জগদীশচন্দ্রও সৌধ-অলিন্দে নিবেদিতার আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।) নিবেদিতা ছিলেন ক্লান্তিহীন পত্রলেখিকা; আর তাঁহ'র এই 'বাতিকের' কল্যাণেই ভারতবর্ষে তাঁহার সমগ্র যুগটারই চিত্র আমাদের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে।

এই চিত্রকেই আবার জীবন্ত করিয়া তুলিতে গিয়া সানন্দ এরবের-দম্পতি আমাদিগকে বলিলেন, একই বিষয়ে নিঃসন্দেহে তাঁহাদিগকে দুইটি পৃথক্ খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে: একটি হইবে সম্পূর্ণ, যাহা সুদীর্ঘকাল না ছাপিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, যাহাতে নিবেদিতার ইতিহাসের সহিত জড়িত আছেন এমন সব ব্যক্তি যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়; অন্যটি হইবে সংহত।

একটি ট্র্যাজিক ঘটনা নিবেদিতার জীবনের শেষ বৎসরটিকে বেদনামণ্ডিত করিয়াছিল। বিবেকানন্দের বান্ধবী শ্রীমতী অলি বুল অত্যন্ত অসুস্থা হইলে নিবেদিতা তাঁহাকে প্রাচীন আয়ুর্বেদিক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সব সময় এইরূপ ঔষধ ব্যবহৃত হয়, ফলও হয়। তিন দিন পরে শ্রীমতী অলি বুল মারা যান। এবং তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিবেদিতাকে দান করিয়া যান। প্রতারণা করিয়া নিবেদিতা এই সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া নিবেদিতার বিরুদ্ধে শ্রীমতী বুলের আত্মীয়স্বজন মামলা করেন এবং অভিযোগ করেন যে, নিবেদিতা শ্রীমতী বুলকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। নিবেদিতার বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়। আর এই

শোকে ও এই অপবাদে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভারাক্রান্ত হইয়া ছিলেন, এবং ইহাতেই তাহার মৃত্যু ত্বরান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু ( নিজেদের মধ্যে বলিতেছি ) তিনি কেমন করিয়া এ সম্পত্তি লইতে পারিয়াছিলেন ? তিনি লইয়াছিলেন নিজের জন্য নয়, এবং ইহা দিয়া তিনি পুরাপুরি ভারতবর্ষেরই উপকার করিয়াছেন—(আর বিশেষ করিয়া উপকৃত করিয়াছেন জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরকে)। তিনি তাঁহার বিশ্রাম, এমন কি তাঁহার সম্মানও, ভারতবর্ষের স্বার্থে বিসর্জন দিয়াছেন—একথা আমাকে বলা বৃথা, আমি ইহা মানি না। সীজারের পত্নীর—বিবেকানন্দের মহীয়সী শিষ্যার—সন্দেহভাজন হইলে চলিবে না। বিবেকানন্দ কখনও তাঁহাকে অনুমতি দিতেন না।

[ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অল্পকালের মধ্যেই বহু দেশ স্বাধীনতা হারাইল, রোলাঁর জন্মভূমি নাৎসী জার্মানির পদানত হইল। ফ্রান্সের একভাগের শাসন রহিল প্রত্যক্ষভাবে জার্মানির হাতে, অন্যভাগের শাসন রহিল জার্মানির তাঁবেদার কুখ্যাত ভিসি-সরকারের হাতে। যে শান্তি ও অহিংসার জন্য রোলাঁ সারাজীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিশিখা ও ধূমে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয় ও যুদ্ধের অবসান দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য রোলাঁর হয় নাই। উহার এক বৎসর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পর হইতে 'ভারতবর্ষ' সম্পর্কে রোলাঁর দিনপঞ্জী অতিশয় সংক্ষিপ্ত। কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র। ]

১৫ই জুন, ১৯৪১॥

প্যারিস। নৈশ আহারের পর জাঁ এরবের আসিলেন। তিনি তাঁহার বাবাকে দেখিবার জন্য অপর অঞ্চল পার হইয়া

আসিতে পারিয়াছেন ( তাঁহার বাবা নত্র্-দাম-দে-শাঁ রাস্তায় আমার প্রতিবেশী··· )। ভারতবর্ষ সম্পর্কে গ্রন্থগুলির প্রকাশনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিলাম, এরবের সেগুলি সম্পাদনা করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী সাঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে শঙ্কর সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছেন, অসংখ্য বুদ্ধিজীবী তাহা শুনিতেছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে আছেন বহু পাদরি ও সন্ন্যাসী, তাঁহারা লুব্ধভাবে ভারতীয় যোগের পদ্ধতিগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। তরুণ অধিবিদ্যাবিশারদরা সর্বাধিক বিমূর্ত এই তত্ত্ববিদ্যায় ঝাঁপ দিয়াছেন। আমার বইগুলি এখন তাঁহাদের কাছে খুবই অপরিণত মনে হয়: দশ বছর আগে এগুলি তাঁহাদের কাছে নিতান্ত অখ্যাত ছিল, তাঁহারা তখন এগুলির কথা কানেও তুলিতেন না। শ্রীমতী এরবের নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁহার বইটি শেষ করিয়াছেন, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ভারতীয় বিদ্রোহের ও আন্দোলনের সবকিছু উহার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে ও স্পষ্ট হইয়াছে। ওকাকুরা যে ভূমিকা লইয়াছিলেন, তাহাও ইহাতে আছে। এরবের রামকৃষ্ণের চিন্তার সম্পূর্ণতম এক সংকলন করিয়াছেন এবং তাহার সেই দেশী কাঁচা রঙটাও ফিরাইয়া আনিয়াছেন, যাহা তাঁহার শিষ্যরা সংকোচভরে ঢাকিয়া রাখেন।

# পরিশিষ্ট

[ এক ]

## 'ওয়ার্ড্‌স্ অব দ্য মাস্টার' গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থটি শুধু একটি শিক্ষা-প্রণালী নয়, ইহা একটি জীবন্ত মানুষ। এই সরল হিন্দু-গুরুটির—যাঁহার কণ্ঠস্বরকে শ্রীমতী ই. ফন্ পেলেট পাশ্চাত্যের জন্য জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—বলার অভ্যাস ছিল যে, প্রচার নয়, বাঁচানো, এবং এই এক সত্য-জীবনের দৃষ্টান্তের মধ্যেই এক সত্য-শিক্ষার সন্ধান মিলে। এইজন্যই অবাধ আলাপচারীর মাধ্যমে প্রতিফলিত তাঁহার মূর্তিটিকে আমাদের জন্য অবিকল ধরিয়া রাখিতে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা জাগিয়াছিল। যিনি তাঁহার কথাগুলি পড়িবেন, তিনিই তাঁহার অনুপ্রেরিত মধুর স্মিত হাস্যের, তাঁহার বাচনভঙ্গির কোমল ও চতুর স্বাভাবিক মাধুর্যের এবং প্রেমের সেই সমুজ্জ্বল সূর্যালোক যাহা তাঁহার সকল চিন্তাকে আবৃত করিয়াছে—তাহার দাক্ষিণ্যের স্বাদ পাইবেন······যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহার সকল ভালোকে ভালোবাসো। কারণ, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখা যায় ·· রামকৃষ্ণ হইতে যে প্রজ্ঞা বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার সকল কিছুর মধ্যেই ইহাই প্রথম ও শেষ কথা। প্রত্যাখ্যানের কিছু নাই, সকল কিছুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে······।

ইহা আমাদের কাছে কোনরূপ অন্ধ-আদর্শ লইয়া আসে না, বরং লইয়া আসে অসংখ্য গুণে বেশি সমস্ত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সৌভ্রাত্রপূর্ণ এক ভালোবাসা···তাহারা সকলেই সহোদর···।

আর এই কারণেই, সংকীর্ণ ও স্বৈরাচারী মতবাদগুলির গর্বোদ্ধত অহমিকা, যেগুলির প্রত্যেকটি নিজস্ব একাধিপত্য জগতের উপরে

চাপাইয়া দিতে চায়,—সেগুলির মধ্যে পতিত ছিন্নভিন্ন আমাদের এই ইউরোপের কাছে ইহারই অধিক প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ-ঐতিহ্য যিনি পরিচালনা করেন, সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ—যাঁহাকে তাঁহার গুরু-সম্পর্কিত আমার সাম্প্রতিক বইটি পাঠাইয়াছি—আমাকে উত্তরে লিখিয়াছেন :

"আমি আশা করি যে, আপনার কাজটি খ্রীষ্টানকে প্রকৃত খ্রীষ্টান হইতে, হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু হইতে, মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান হইতে সাহায্য করিবে (আমি যোগ করিঃ 'স্বাধীন-চিন্তাশীল-দিগকে প্রকৃত স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে')। ইহা আমাদিগকে যেন সেই পথ দেখাইতে পারে, যে-পথ ধরিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে—ইহাই জানার জন্য যে, আমরা সকলেই একই পিতার সন্তান!"

ইহাই রামকৃষ্ণের চিন্তার অনুগত ভাব-সংগতি: এই একটি শব্দের মধ্যেই সবটুকু প্রকাশ পায়।...সকল চিন্তার মধ্যে সংগতি—শাশ্বত ঐক্যের ও শাশ্বত পরিণতির সংগতি—সংগতি প্রতিটি জীবন্তের।

বর্তমান যুগ ইহা হইতে অনেক দূরে!

এই তো অরফিউস থ্রেসের মরুভূমিতে। তাঁহার পবিত্র সঙ্গীত যেন খেঁকশিয়াল ও নেকড়েদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে!

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ রোমাঁ রোলাঁ

[ দুই ]

## জাঁ এরবেরকে লেখা দুইখানি পত্র

[ক]

ভিল্‌ন্যভ, ভিলা অল্‌গা
ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি আনন্দিত যে, আপনার যত্নে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ বাণী ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সংকটের এই বহুপ্রসূ অথচ বেদনাময় যুগে তাহাকে তাঁহার কিছু দেওয়ার আছে। ইহা এ যুগের বহু উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার উত্তর দিবে।

সব কিছুর আগে, ইহা যুক্তিতে বিশ্বাস আনে। ইহা সেইসব ধর্মীয় চিন্তা নয়, যাহা আলোতে চোখ মিটমিট করে, যাহারা "বিশ্বাসে মিলয়ে···তর্কে বহুদূর"-এর মধ্যে আশ্রয় লয়। ইহা হইতেছে মানব-মনের ঋজুতা ও শক্তিতে বিশ্বাস···

"মানুষের মহিমা তাহার চিন্তার মধ্যে···"

তাহা ছাড়া, ইহার এই ঔদার্য আছে যে, সত্য-সন্ধানের বিবিধ ও বিচিত্র রূপের কোনটিকে ইহা অগ্রাহ্য করে না। ইহা সকলকে স্বীকার করে এবং সকলকে ভ্রাতৃত্বভরে আলিঙ্গন করে। ইহা মনের এক বিশ্বজনীনতা, যাহার মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া ও সহযোগী হইয়া থাকে বিজ্ঞান ও ধর্ম—আন্তরিক ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ইহার একমাত্র শত্রু অসহিষ্ণুতা।

আমাদের মানুষকে যুগের যেসব সমস্যা আন্দোলিত ও বিভক্ত করিতেছে, তাহার একটির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উত্তর: সে-সমস্যাটি

সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমস্যা। "মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি' আবার পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম। ভারতীয় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার স্বতঃলব্ধ জ্ঞান কীভাবে অজ্ঞাতসারে কমিউনিজমের মহান্ ব্যাখ্যাতাদের পৌরুষময় যুক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে: মার্কস্ ও লেনিন বিবেকানন্দের এই সুমহৎ বাণীটি দাবী করিতে পারিতেন:

"একমাত্র সেই বাঁচে, যে সকলের মধ্যে বাঁচে।"

ইঁহারা দুইজনেই যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তবে সংগ্রাম করেন বাড়াইয়া-তোলা ব্যক্তিস্বরূপের নামে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

"যখন পরমের কথা বলা হয়, লোকে আতঙ্কিত হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করে: 'কিন্তু আমার ব্যক্তিস্বরূপের পরিণাম কী হইবে?' তাহাদের ব্যক্তিস্বরূপ বস্তুটি তাহা হইলে কি? তাহা দেখিতে চাই··· ব্যক্তিস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই···আমরা কেহই এখনও ব্যক্তি নই। আমরা ব্যক্তি-স্বরূপের দিকে যাইবার প্রয়াস করি।—আর তাহাই এই পরম, ইহাই আমাদের যথার্থ প্রকৃতি। একমাত্র সে-ই বাঁচে, যে সবকিছুর মধ্যে বাঁচে···সেগুলিই আমাদের সত্য-জীবনের একমাত্র মুহূর্ত যখন আমরা বাঁচি অপরের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে··· ।"

মহান্ স্বামীজী নিজের মধ্যে মানুষ ও পরম সত্তার আলাপন উপলব্ধি করিয়াছেন বিশ্বজনীন ঐক্যে—সত্যে, যাহা বাঁচে এবং যাহা সক্রিয় হয়: "···সত্য। তাহারই সঙ্গে যেন এক হই।···

কিংবা যদি তাহা না পারো, তবে সেই স্বপ্ন দেখো, যাহারা তাহার কাছে আগাইয়া যায়।

যাহারা অনন্ত প্রেম ও নিঃশর্ত সেবা!"

রোমাঁ রোলাঁ

[খ]

ভিল্‌ন্যভ, ভিলা অল্‌গা,
২০শে এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় ম॑. জ॑। এরবের,

আপনার চিঠি যখন পাই, তখন আমি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, সঙ্গে ভীষণ জ্বর। সমস্ত কাজকর্ম নিষিদ্ধ। তবু জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধির মাঝখানে আপনার চমৎকার অনুবাদটি পুনর্লিখনের জন্য একটা সুযোগ লইয়াছি। আপনার অনুবাদ খুব সামান্যই বদলাইতে হইয়াছে। আর এই কাজ শেষ হইবার পরেই আমি দেখিতে পাইলাম, আপনি যেন চাহিতেছেন যে, আমি ১৯৩৬ সালের ফরাসী সংস্করণে এই পাঠটি ব্যবহার করি। আমি নূতন করিয়া কপি করিতে শুরু করিবার পক্ষে একান্তই ক্লান্ত।

আরও বলিতেছি, ১৯৩০ সাল হইতে আমার চিন্তার উদ্‌বর্তন হইয়াছে ; আমাকে সামাজিক কাজে নামিতে হইয়াছিল : তাহা ছিল আমার নৈতিক প্রয়োজন। আর আমার মনের এলাকাটি, যেখানে আমি সবকিছু বুঝিতে ও সবকিছুকে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করি, যদি বা তাহা যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকি, কর্মক্ষেত্রে কিন্তু 'কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান না-করা' এবং 'যাহা কিছু আছে, তাহার সবকিছুকে ভালোবাসা' অসম্ভব। যাহা কিছু অকল্যাণকব, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং সমাজ-জীবনের উন্নযনে যাহা কিছু প্রতিকূল, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। তাই সংশোধন না করিয়া ১৯৩০ সালের লেখাটিকে আবার ১৯৩৬ সালের উপযোগী রূপে নূতন করিয়া লিখিতে আমি পারিব না।

রামকৃষ্ণ-বিষয়, যাহা আমার বর্তমান ধারণাটিকে সর্বাধিক যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাহা হইল 'জীবই শিব', ইহা লিখিয়াছি

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবং রামকৃষ্ণ-মিশন তাঁহাদের শতবার্ষিকী গ্রন্থে উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাই আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, ১৯৩০ সালের তারিখ সহ শ্রীমতী ই. ফন পেলেটের গ্রন্থের জন্য লিখিত আমার ভূমিকাটি ছাপিবেন। নতুবা আপনি যে ভূমিকা লিখিবেন, তাহাতে উহার অংশ ব্যবহার করিতে পারেন।

জবাব অল্পকথায় দিলাম বলিয়া মার্জনা করিবেন, এবং আপনার প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে অনুরক্ত আছি বলিয়াই জানিবেন।

রোমাঁ রোলাঁ

[ তিন ]

# "জীবই শিব"

## শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে ফ্রান্সের এক তীর্থযাত্রীর অর্ঘ্য

( রামকৃষ্ণের জন্ম শতবর্ষ, ১৯৩৬-৩৭, উপলক্ষে )

কাহিনী আছে যে, অভেদের বক্ষে পরম সমাধির প্রথম দিনগুলির পর,—ঘটনাটি তোতাপুরীর প্রস্থানের পর,—রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার চৈতন্যকে মর্ত্য ধরণীতে ফিরিয়া আসিতে দিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, দুইজন মাঝি ঘৃণাভরে কলহ করিতেছে। এই ঘৃণায়, একটি ক্ষতের মতোই, তাঁহার হৃদয়ে রক্ত ঝরিয়াছিল, আর তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বেদনা তাঁহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল। কারণ, তাঁহার নবজাত চৈতন্যের অতি-কোমল ত্বকে জগতের সমস্ত বেদনা ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছিল।

যখন মনে হইতেছে, সমস্ত মানবতা ঘৃণায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে, যখন জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধের আগুন জ্বলিতেছে কিংবা সে আগুন ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে—তখন বর্তমান জগতের এই দিনগুলিতে তিনি কী অনুভব করিতেন, কী যন্ত্রণা ভোগ করিতেন! কিন্তু পরমহংসের দুইটি পক্ষ ছিল, সেগুলির উপর ভর দিয়া তিনি ঊর্ধ্বে ভাসিয়া বেড়াইতে পারিতেন। যন্ত্রণাকে এড়াইবার জন্য তিনি যদি অন্যান্য সব অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতো ইহা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া থাকেন, তবে তাহা তিনি করেন নাই এইজন্য যে, বিশ্বজনীন প্রেম যাহা তাঁহার কাছে দ্বিতীয় দৃষ্টি ছিল, তাহাই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখে, তাঁহার কাছে এক বিদ্যুৎ-ঝলকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল যে, 'জীবই শিব,' জীবন্ত সত্যই ঈশ্বর,—যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাহাকে এই যন্ত্রণা, এই দুঃখদুর্দশার মধ্যে, এমন কি এই ভুলভ্রান্তি ও স্খলন-পতনের

মধ্যে, মানব-স্বভাবের এই ভয়ংকরের মধ্যে, তাঁহার সহিত একাত্ম হইতে হইবে।

আমরা সবাই জানি, তিনি তাঁহার মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য অতল ঈশ্বরের মোহপাশ হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আপনারা তাহাই সুসম্পন্ন করিতে শিখিয়াছেন ; আপনাদের রামকৃষ্ণ-মিশন আপনাদের প্রতীক-চিহ্নের হংসের মতোই দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাগ্যহীনদিগকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, ভ্রাতৃত্বভরে তাহাদের সেবা করিতেছে। আপনারা আপনাদের গুরুর বাণীকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

"যদি মনের শান্তি চাও, তবে অপরের সেবা কর ! যদি ঈশ্বরকে পাইতে চাও, মানুষের সেবা কর !"

এত সব ধর্মের দৌর্বল্য ও সর্বনাশ ঘটিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা মানুষকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর তাহার দিক্ হইতে মানুষও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সে নিজেকে সাহায্য করিতে শিখিয়াছে ( যাহারা ঈশ্বরকে ডাকিয়া মরিত, তাহাদিগকে আমাদের ইউরোপের শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই অতি-ধার্মিক বীঠোফেন যেমনটি বলিতেন : "ওরে মানুষ, নিজেই নিজেকে সাহায্য কর্ !" )। যেসব খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বহু ক্ষেত্রেই নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার তাঁবেদারি ও দাসত্ব করে, সেইসব খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সহিত যখন সে ঈশ্বরকে এক করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও নিজেকে সাহায্য করিতে শিখিয়াছে। ইতিহাসের গতিপথে বহু ক্ষেত্রেই, অতীতে ও বর্তমানে, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির নেতাদের নিয়ম ছিল ও আছে, যে-শক্তি বিজয়ী হইবে, সেই শক্তির পাশে গিয়া তাহারা ভিড় করিবে। এইভাবেই শক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত অন্যায় ও অবিচারের সহিত তাহারা নিজেদিগকে জড়িত করিয়াছে। মানুষ যখন অন্যায়-অবিচারের

শক্তির—যে শক্তি হইতে তাহারা নিজেদিগকে মুক্ত করিতে চায়—বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালে ঐ শক্তির সহিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলিকে জড়াইয়া ফেলে, তখন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির অবাক হইবার কিছুই থাকে না। এই অভ্যুত্থিত মানুষ নিজেদিগকে ঈশ্বরবর্জিত বা ঈশ্বর-বিরোধী মনে করিলেও, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামে, তাহাদের আলোর ঊর্ধ্বাভিযানে, তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেও অবশ্যই জীবন্ত ঈশ্বর ··'জীবই শিব!' আর ইহাই আমাদের জানিতে হইবে।

আজ আমরা এক বিপর্যস্ত জগতে রহিয়াছি। আর বাস্তবিকই জনসাধারণ চিরকাল নিপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু আজিকার দিনের পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন সম্পর্কে তাহাদের পরিচয় ও চেতনা ছিল না—যাহা তাহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে 'যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান মাধ্যমগুলি এবং আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের অগ্রগতি। আজ যাহারা তাহাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য, আরও বেশি ন্যায়সংগত ও আরও বেশি মানবিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য, জীবন-মরণ প্রচেষ্টা চালাইতেছে, সেইসব মানুষ হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি না। আর তাহা বিশেষ করিয়া পারি না আমরা, আপনাদের পশ্চিমের বন্ধুরা, যাহাদের আপনাদের মতো 'মরণোত্তর জীবনে' বিশ্বাস নাই। সময় আমাদিগকে তাড়া দিতেছে। কোটালের বানের মতো মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার স্রোত আমাদিগকে ডুবাইয়া মারিতেছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমাদিগকে ছুটিয়া যাইতে হইবে। যদি আমাদের সম্মুখে 'মরণোত্তর জীবন' থাকিত-ও, তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি জীবন্ত বস্তু, যে বিশেষ সময়ে সে জন্মিয়াছে এবং যে মানব-পরিবেশের মধ্য দিয়া সে আগাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার নিজের যথোপযুক্ত কর্তব্য ও নিয়ম-নীতি আছে। সে যতটুকু পারে, তাহার সবটুকু বর্তমান মঙ্গল না করিলে চলিবে না, তাহার আজিকার সমস্ত

শক্তি দিয়া আজিকার সমস্ত অন্যায় আচরণের বিরোধিতা না করিলেও তাহার চলিবে না। পশ্চিমের রামকৃষ্ণপন্থী আমি, আমি স্বীকার করিব না যে, যখন নিপীড়িতদিগকে বাঁচাইবার জন্য সক্রিয় হওয়া আশু প্রয়োজন, তখন নিজের মুক্তির জন্য কেহ কর্ম হইতে বিদায় লইতে পারে। আমি আবার স্মরণ করিব মহান্ শিষ্যের সেই পুণ্য ক্রুদ্ধ বাণী, তাঁহার এক ভ্রাতা ঈশ্বরের মধুর স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান জগতের বেদনাকরুণ পরিণাম এড়াইতে চেষ্টা করিলে তিনি যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

"বেদান্ত পড়া, ধ্যান অভ্যাস করা পরজন্মের জন্য তুলে রাখ। অপরের সেবার জন্য আজকের এই দেহ উৎসর্গ কর।"

"আমি যেন বারংবার জন্ম লই এবং সহস্র দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করি, যাহাতে আমি এই একমাত্র ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে পারি, যিনি বর্তমান আছেন,—সেই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি আমার বিশ্বাস, যিনি আমার সমস্ত সত্তার যোগফল,—সর্বোপরি, যিনি আমার দুষ্কৃতকারী-ঈশ্বর, যিনি আমার আর্ত-পীড়িত-ঈশ্বর, যিনি আমার সমস্ত জাতির, সমস্ত প্রজাতির দরিদ্র ঈশ্বর।"

হায়! ধার্মিক ঈশ্বর-প্রেমিকদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ বিশ্বাসের কী ভ্রান্তি যে, সমস্ত মানুষের সহিত সংযোগে তাহাদের প্রেম হ্রাস পাইবে, তাহাদের সত্তা খর্ব হইবে! চিরবাহিনী গঙ্গার মতো, চির-গতিশীল লক্ষ লক্ষ রূপের সহিত অসংখ্য সত্তাকে, সমগ্র সত্তাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহা, তাহার বিপরীত, নবজীবনই লাভ করিবে, বৃহত্তর হইবে।

এইভাবে আপনারা তাহার সহিত পরিণীত হইয়া জীবন্ত ভগবানের প্রতিটি রূপের সেবা করিবেন। কিন্তু কখনও সেই অনুভূতি ও সেই সর্বশক্তিমান 'একত্বে' উপস্থিতি ভুলিয়া যাইবেন না, যাহার মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ ছন্দময় রূপ সমন্বিত হয়। যে অপরিবর্তনীয় শান্তি অস্তিত্বের ঝড়ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে সঞ্চরণ করে, সেই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে যাহারা

ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলে তাহাতে শান্তি ব্যাহত হয় না। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদিগকে একথা বারংবার বলিতে বিরত হইতেন না যে, তাঁহারা যে দুইটি শপথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রথমটি যদি হয় 'সত্যকে উপলব্ধি করা', দ্বিতীয়টি হইবে 'জগৎকে সাহায্য করা'। 'মানুষকে একাই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে হইবে।' তাই আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিব, যাহারা 'একাকী-ই' বীরের মতো 'নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে' চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিব। এমন কি, এই একই ভাবে পরে শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলির সমন্বয়সাধনে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

এই ছিন্নভিন্ন জগতে আপনারাই পরম সমন্বয়ের বাহক, যে সমন্বয়ের মধ্যে সংগ্রাম ও বিরুদ্ধ-প্রচেষ্টাগুলিকে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে হইবে। যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ অন্ধের মতো হুড়াহুড়ি করিতেছে, সেখানে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিকিরণ করাই আপনাদের নিজস্ব ভূমিকা, আপনাদের বিশেষ অধিকার এবং আপনাদের পবিত্র কর্তব্য। রামকৃষ্ণের মতোই আপনারা হইয়া উঠুন বিশাল বটবৃক্ষ, যাহার ছায়াতলে রণক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত লক্ষ লক্ষ হৃদয় আশ্রয় লইতে, শান্ত হইতে আসিতেছে! তাহাদের সমন্বয়ের সেই মধুক্ষরণ করুন, যাহা যুক্তির ফল, যাহা প্রেমের ফলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমরা ভালো করিয়াই জানি যে, যাহারা পথভ্রষ্ট, তাহারাই সবচেয়ে দুঃশীল। তাহারা কী করে, তাহা তাহারা জানে না। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত মানুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন এক কাপুরুষোচিত আক্রমণে আহত হইলে বুদ্ধিদৃপ্ত স্মিতহাস্যে এই বলিয়া বন্ধুদের প্রতিশোধস্পৃহা শান্ত করিয়াছিলেন: "কী করবে বলো? যে যেভাবে বোঝে, সে সেভাবেই কাজ করে!"

যাহা সে জানে না, তাহা হইতেই জগতের দুর্দৈব আসে। তাহা তাহাকে জানাইতে, শিখাইতে হইবে। তাহা আলোকোদ্ভাসিত করিতে

হইবে। কারণ, যে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, সে জানে না যে, সে নিজেরই ক্ষতি করিতেছে। আমাদের ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর এক মানুষ জ্ঞানী কবি ভিক্তর হিউগো, যাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন, যাহা ভারতীয় জ্ঞানের এতোই সগোত্র: "ওরে মূঢ়, তুমি ভাবো যে তুমি আমি নও।"

রামকৃষ্ণের পরম অলৌকিকতাই এই যে, তাঁহার মধ্যে 'তুমিই' হইতেছে 'আমি'; সমগ্র জগৎ কেবলমাত্র নিজেকেই প্রতিফলিত করে না, মানুষের এক হৃদয়ে মূর্ত হইয়া উঠে, মাটির পৃথিবীতেই ঈশ্বর নিজের বিশ্বজননীনতা এবং নিজের বহুত্বের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করেন…'জীবই শিব' ..আর রামকৃষ্ণ নিজের মধ্যে—আমাদের মধ্যে পাঠাইয়া দেন দিব্য অভেদকে।

রোমাঁ রোলাঁ

[ ১৯৩৭ সালের 'আঁক্সিআঁ এ পাঁসে' পত্রিকায় ( জেনেভা ) প্রকাশিত ]

# নির্ঘণ্ট